শৃঙ্খল

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

*   *
*

তৃতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়

শ্রীচরণেষু,

শৃঙ্খলে

এই লেখকের

রঞ্জনী, আকাশ ও মৃত্তিকা, বসন্ত রজনী, ঘরের ঠিকানা, ক্ষণবসন্ত দেহযমুনা মনের গহনে, ময়ূরাক্ষী গৃহকপোতী সোমলতা, শতাব্দীর অভিশাপ, শ্মশানঘাট, কৃষ্ণা, মধুচক্র, হংসবলাকা পান্থনিবাস

ছেলেদের

ডাকাতের সর্দার হরেক রকম

[১]

গ্রামে-ঘরে চিত্ত-চাঞ্চল্যকব চমকপ্রদ ঘটনা বড বেশি ঘটে না। বছব পনেবো পূর্বে তাবক চক্রবর্তীব স্ত্রী কলেরায মারা যায়। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত বাত্রি নাবালক শিশু-পুত্রেব হাত ধবিযা গ্রামেব প্রত্যেক দ্বারে ঘুবিযাও তাবক স্ত্রীর সৎকাব কবিবাব লোক সংগ্রহ করিতে পাবে নাই। শেষে ভোবেব দিকে নিজেই স্ত্রীর মৃতদেহ বুকে করিযা গ্রামেব মাঠেই কোনোবুপে দাহকার্য সম্পন্ন কবে। তাহার স্ত্রী অন্তিমে গঙ্গা পায় নাই।

ঘোঁট পডিযাছিল সেই বছব। সমাজপতিব দল তাবকের এই অহিন্দু আচবণ ক্ষমা কবিতে পারে নাই। তাহারা শ্রাদ্ধেব সময ইহাব শোধ তুলিবার জন্য ভিতবে ভিতবে পবামর্শ করিতে লাগিল। এই দশটি দিন তাহাদের যেন আব কাটিতে চাহিতেছিল না। বৃদ্ধেব দল যুবকদেব শ্রাদ্ধ-দিবস পর্যন্ত ধৈর্য ধবিবাব পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওযা সত্ত্বেও তাহাবা কযেকবাবই তারকেব বাডির আনাচে-কানাচে হৈ-চৈ কবিযা ফিবিয়া আসিল। কিন্তু যাহাব পত্নীর শ্রাদ্ধ পণ্ড কবিবাব জন্য এত আযোজন, না পাওয়া গেল তাহাব দেখা, না পাওযা গেল কোনো সাড়া। শ্রাদ্ধেব দিন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তাবকের বাড়ির দবজায প্রকাণ্ড বড় একটা তালা ঝুলিতেছে। সমাজপতিদের এত আযোজন পণ্ড করিযা তাহাবা পিতা-পুত্রে যে কোথায় সরিয়া পড়িল আজ পর্যন্ত তাহার সন্ধান পাওযা যায় নাই।

গত পনেরো বৎসর এই একটি কাহিনী রোমন্থন করিয়াই গ্রামের লোকে কোনোরূপে দিন যাপন করিয়া আসিতেছে। এমন সময় আব একটি ঘটনায় গ্রামের বাতাস গরম হইয়া উঠিল,—ছেলেবুড়ার আহারনিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যাযেব ভালো ছেলে বলিয়া গ্রামে একটা খ্যাতি ছিল। ইস্কুলের এবং কলেজের পরীক্ষাগুলি ভালো করিয়া পাশ করিয়া সম্প্রতি সে কোনো কলেজে অধ্যাপকের পদ খালি হইযাছে কি না খবরের কাগজে তাহারই সন্ধান করিতেছিল।

এমন সময় অকস্মাৎ দৈবদুর্বিপাক'

একদিন দেখা গেল বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী অমলার দ্বার অনেক বেলা পর্যন্ত অর্গল-বন্ধ। এত বেলা পর্যন্ত তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে না দেখিযা বিশ্বেশ্বরের বিধবা জননী আনন্দময়ী অমলার কক্ষদ্বারে গিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। গত কয়দিন হইতেই পুত্রের সঙ্গে বধূর মনোমালিন্য চলিতেছে এ সংবাদ তিনি রাখিতেন। তাই আর বিশেষ জিদ না করিয়া নিজের কাজে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বেলা এগারোটা বাজিযা গেলেও যখন অমলা দ্বার খুলিল না বা বাহিরে আসিল না, তখন আনন্দময়ী সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অমলা বড়লোকের একমাত্র কন্যা, অত্যন্ত জেদী। তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। আনন্দময়ী এ দিকে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু কথাটা সে তেমন গায়ে মাখিল না। অগত্যা সমস্ত কাজ ফেলিয়া তিনিই আবার বধূর কক্ষে ছুটিলেন, কিন্তু বহু ডাকাডাকি করিযাও কোনো উত্তর মিলিল না। দরজায় কান পাতিযা শুনিলেন, ঘর একেবারে নিস্তব্ধ: নিশ্বাসপতনের শব্দ পর্যন্ত নাই। সেই নিস্তব্ধতায় তাঁহার বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—ওরে বিশু, ছুটে আয়!

বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিল। ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যাহা

দেখিল তাহাতে উভয়েরই বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। অমলা বহু পূর্বেই মারা গেছে। তাহার হিম-শীতল দেহ একেবারে কাঠের মতো শক্ত। আনন্দময়ী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। বিশ্বেশ্বরের যেন কিছুতে বিশ্বাস হইতেছিল না। সে বারবার অমলার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যেই ঘটনাটি সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

পাড়ার মহিলাগণ এক এক করিয়া সমবেত হইয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বাড়িটি মুখর করিয়া তুলিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্যে এই সান্ত্বনা তাহাদের একজন সেই শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন,- আর একজন ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

ওদিকে তারিণী চৌধুরীর বালাখানায় তখন জোর পরামর্শ-সভা বসিয়াছে, এই যে দিনে-দুপুরে স্ত্রীহত্যা হইয়া গেল ইহার প্রতিকার কি? নটবর হালদার বলিল, তাহার স্ত্রী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন অমলার গলায় লাল দাগ। অমলাকে যে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, এবিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। কিন্তু তারিণী চৌধুরী চুটাইয়া প্রজা ঠেঙ্গাইয়া এবং সুদের দায়ে খাতককে সর্বস্বান্ত করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। নটবর হালদারকে তিনি চেনেন, বিশ্বেশ্বরকেও চেনেন। কথাটা তিনি মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও প্রকাশ্যে বলিলেন,—তা'হলে কি করা যায়?

এদিকে হিতসাধন-মণ্ডলীর ছেলের দল কোমরে গামছা বাঁধিয়া বিশ্বেশ্বরের বাড়িতে হাজির হইল। এই দলটি বিশ্বেশ্বরের নিজের হাতে গড়া। দু'চারিজন কলেজে পড়ে, বাকী সব ইস্কুলের ছাত্র। গুণেন্দ্র আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে সান্ত্বনা দিতে বসিল। বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—ওসব কথা পরে শুনবো ভাই। আপাতত সৎকারের আয়োজনটাই আগে করা কর্তব্য।

তাহাদের আর কিছুই বলিতে হইল না। দশ বারোজন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ উঠানে নামাইল।

এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে তারিণী চৌধুরীর বালাখানায় পেঁছিল। নটবর হালদারের দল রুখিয়া উঠিল। পুলিশ আসিবার আগে তাহারা কিছুতেই লাস দাহ করিতে দিবে না। তারিণী চৌধুরী চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। নটবরকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, –ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর চেয়ে না করানোই ভালো। লাস দাহ করুক ওরা বুঝেছ?

কথাটা চট করিয়া নটবরের মনে লাগিল। তাহার দল রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল কুচ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তারিণী চৌধুরী বলিলেন লাস চলে গেলেই থানায় খবর পাঠানো দরকার বোধ হয়।

এই কথাটা এতক্ষণ কাহারও মনেই হয় নাই। বিশ্বেশ্বরের শ্বশুর বেশ ধনী লোক। তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। নটবর সেইমত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া গেল। সেই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তারিণী চৌধুরীর হুকুম না লইয়া কোন কাজ করে না।

পুলিশ এবং সৎকারকারী ছেলের দল বিভিন্ন পথে প্রায় একই সঙ্গে গ্রামে পেঁছিল।

কাল সমস্ত দিনরাত্রি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে জল্পনা, কল্পনা ও অনুমানের বিরাম ছিল না। কিন্তু পুলিশ আনার ব্যাপারটি এতই সঙ্গোপনে ও সু-কৌশলে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইয়া উঠিল।

বেলা তখন ন'টার বেশী হইবে না, প্রকাণ্ড একটা লাল ঘোড়ায় চড়িয়া

বড় দারোগা এবং তাহার পিছনে পিছনে একদল কনেস্টবল আসিয়া বিশ্বেশ্বরের বহির্দ্বারে সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে গোটা কয়েক চৌকিদার এবং স্বয়ং নটবর বাবুও উপস্থিত হইল।

বিশ্বেশ্বর তখন মায়ের ঘরে তাঁহার পা'তলার দিকে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পুলিশের আসার সংবাদ পাইয়া আনন্দময়ী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কোনো কাজেই সহজে ব্যস্ত হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। উদ্বিগ্নমুখে, অথচ শান্ত কণ্ঠেই তিনি বলিলেন,—পুলিশ আবার কেন?

তাহার গৃহে পুলিশের শুভপদার্পণের হেতু কি তাহা বুঝিতে বিশ্বেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু মায়ের উদ্বেগবৃদ্ধির আশঙ্কায় শুধু বলিল দেখি তো।

ঠিক সেই সময় দূরে ধ্বনি উঠিল, বল হরি, হরিবোল। আনন্দময়ী আবার নির্জীবের মতো শুইয়া পড়িলেন।

বিশ্বেশ্বর বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে একজন চৌকিদার দারোগার ঘোড়াটি সামনের একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে ছেলের দলের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় একখানা চেয়ার বাহির করিয়া দিয়া দারোগাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

দারোগা কিন্তু এই আতিথ্যের জন্য কোনো ধন্যবাদ দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,- আপনার নাম বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়?

হ্যাঁ।

- আপনার স্ত্রী অকস্মাৎ মারা গেলেন কিসে?

দারোগার প্রশ্ন করিবার উদ্ধত ভঙ্গিতে বিশ্বেশ্বর বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, হার্ট ফেল ক'রে।

এ তো আপনার অনুমান মাত্র?

--অনুমান বই কি।

উপস্থিত সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া দারোগা প্রশ্ন করিলেন—তিনি যে আত্মহত্যা করেন নি তারই বা প্রমাণ কি?

—কোনো প্রমাণই নেই। তবে সে রকম সন্দেহ করবারও কোনো কারণ উপস্থিত হয় নি।

দারোগা অকস্মাৎ তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন কারণ উপস্থিত হয়েছে। আমি এমন প্রমাণ পেয়েছি যে আপনারা তার সঙ্গে বরাবর অসদ্ব্যবহার করতেন।

এক মুহূর্ত তাঁহার পানে জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—এ আপনার অনাবশ্যক কৌতূহল। অন্য প্রশ্ন থাকে তো করুন নইলে আমার অন্য কাজ আছে।

বলিয়া বিশ্বেশ্বর তাঁহার দিকে পিছন ফিরিল।

কাজ আমাদেরও আছে বুঝেছেন মশাই? এখানে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতেও আসি নি রসিকতা করতেও আসি নি।

বলিয়া দারোগা এমনভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন যে তাহার পানে চাহিতেই বিশ্বেশ্বরের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন কথাই বলিল না যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাড়াইয়া রহিল।

ওপাড়ার হরিবলা ঘটকের কৌতূহল জিনিষটা অত্যন্ত প্রবল। মেরু প্রদেশ যেমন ছয়মাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে সেও তেমনি ছয়মাস ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। সেই অবস্থাতেই সে বহু শ্রম করিয়া একগাছি লাঠিতে ভর দিয়া কোনো রূপে ঠুক ঠুক করিতে করিতে দারোগা দেখিতে আসিয়াছিল। এই দারোগার বিশেষত্ব গোঁফজোড়াটি। মোম দিয়া মাজা সূক্ষ্মাগ্র এক জোড়া গোঁফ কম্পাসের কাঁটার মতো ঠোঁটের উপর যেন অলগ্নভাবে বসানো। স্থান কাল ঘটনা বিস্মৃত হইয়া হরিবলা একদৃষ্টে সেই গোঁফ জোড়াটির পানেই চাহিয়া ছিল। দারোগা অকস্মাৎ তাহারই পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জানো?

সে বিশাল প্লীহা এবং জ্বরের কম্প লইয়াই ব্যস্ত থাকে এ বিষয়ে

কিছুই জানে না। কিন্তু দারোগার ভারি কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতরটা এমন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল যে, জানি না বলিবার সাহসটুকু পর্যন্ত সঞ্চয় করিতে পারিল না। হরিবলা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক দল লোক চক্ষের পলকে ভিড়ের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোনো লোককে অন্য কেহ ভয় করিতেছে জানিতে পারিলে তাহার মূল্য তাহার নিজের কাছেও অসম্ভবরূপে বাড়িয়া ওঠে। দারোগার তাহাই হইল। তিনি দাঁত মুখ খিঁচাইয়া অত্যন্ত অভদ্রভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বৌটাকে যে আপনিই মেরে ফেলেছেন, তারও প্রমাণ আমি পেয়েছি।

বিশ্বেশ্বরের মুখচোখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—আপনি যতক্ষণ না ভদ্রভাবে কথা কইবেন ততক্ষণ কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না।

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। দারোগা একেবারে সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, খবরদার বলছি, যাবেন না। বলিয়াই একটা চৌকিদারকে মধুর সম্বন্ধে আপ্যায়িত করিয়া বিশ্বেশ্বরকে তাহার জিম্মা করিয়া দিলেন।

নটবর বারান্দার এক কোণে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। এইবার চোখ মেলিয়া সকলের মুখের পানে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

এতক্ষণে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। ভিড়ের ওদিকে দেখা গেল, কয়েকটি সৎকারকারী ছেলেকে চুপি চুপি তাহাদের অভিভাবক একরকম জোর করিয়াই ঠেলিতে ঠেলিতে বাহিরে লইয়া গেল। গেল না কেবল গুণেন্দ্র। কেবল তাহারই কোনো অভিভাবক তাহাকে সামলাইবার জন্য আসে নাই। আসিলেও বিশেষ ফল হইত না। এতক্ষণ নিঃশব্দেই সে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এইবার আগাইয়া আসিয়া দারোগাকে প্রশ্ন করিল,—কিন্তু উনি যে ওঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন আপনিই বা তার কি প্রমাণ পেয়েছেন শুনি?

দারোগা মহাশয় চটিযাই ছিলেন, একেবাবে চড়াসুরে জবাব দিলেন,- তোমার সে খববে কাজ কি হে, জ্যেঠা ছেলে?

গুণেন্দ্র হাসিযা ফেলিল, বলিল,—কাজ আছে বই কি! আমি কি অকাবণেই জিজ্ঞেস করছি?

বিশ্বেশ্বব তখন দাঁতে দাঁত চাপিযা বাগে ফুলিতেছিল। তাহাব পানে চাহিযা গুণেন্দ্র আবাব হাসিযা বলিল,—আপনি মিথ্যে বাগ কবছেন বিশুদা। চোব ডাকতেব সঙ্গে মিশে মিশে ওঁদেব ভদ্রতাজ্ঞানই কমে গেছে, নিজেদেব ভদ্রতা সম্বন্ধেও কমেছে, অন্যেব ভদ্রতা সম্বন্ধেও কমেছে।

দাবোগা মহাশযেব সুদীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যে এত বড বড কথা ইতিপূর্বে কেহ বলিতে সাহসী হয নাই। তিনি ক্রোধে আত্মহাবা হইযা চেয়াব ছাড়িযা উঠিযা পডিযাছেন এবং সমাগত কনেষ্টবল ও চৌকিদাবগণও কি করিবে ভাবিযা না পাইযা চঞ্চল হইযা উঠিযাছে। এমন সময নটবর শশব্যস্তে দাবোগাব কানে কানে বলিযা গেলেন, ছেলেটি সুশীলবাবু, এস, ডি, ও'ব ছেলে।

বাস্। দাবোগাব বাগ জল হইযা গেল। তিনি প্রাণপণে প্রফুল্ল হইবাব চেষ্টা কবিযা স্মিত হাস্যে বলিলেন,- তুমি সুশীলবাবুব ছেলে?

সুশীলবাবুব ছেলে কিন্তু ইহাতে গলিযা গেল না। সে আপনাব প্রশ্নেব পুনবাবৃত্তি কবিযা বলিল আপনি কি প্রমাণ পেযেছেন তাই বলুন।

দারোগা পুনবায মধুব হাসি হাসিয়া বলিলেন গভর্ণমেণ্টেব কাজে বাধা দেওযা আজকালকার ছেলেদেব একটা বোগে দাঁডিযেছে। কিন্তু তোমাব বাবা গভর্ণমেণ্টেব বড চাকবে তোমাব তা সাজে না।

এবারে গুণেন্দ্র একেবাবে জ্বলিযা উঠিল। বলিল, কি গভর্ণমেণ্টেব কাজ বলুন তো? নিবীহ লোককে অপমান কবা? যাব দোষ এখনও প্রমাণিত হয নি তাকে লাঞ্ছিত কবা?

গুণেন্দ্র আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু দাবোগা

বৃথাই পনেরো বৎসর চাকুরী করিতেছেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, চলুন নটবরবাবু, এখন ওঠা যাক। বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

দারোগা সদলবলে উঠিয়া গেলেন। ইহার পর সমস্ত দিন ধরিয়া নানা প্রকার আপোষের কথা চলিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর একটি প্রস্তাবেও রাজি হইল না। সন্ধ্যার পূর্বে অগত্যা দারোগা তাহাকে কোমরে দড়ি দিয়া মহাসমারোহে থানায় লইয়া গেলেন। সেখান হইতে মহকুমা ও পরিশেষে দায়রা আদালতে তাহাকে হাজির করা হইল।

আদালতে বিশ্বেশ্বরের পক্ষ হইতে মামলা চালাইবার কোনো ত্রুটি হইল না। কিন্তু তাহার পক্ষের উকিল তাহার কাছ হইতে কোনোই সাহায্য পাইলেন না। অমলার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সত্যই কোনো কথা সে জানে না। তাহার সহিত অমলার যে প্রায়ই বনিত না ইহাও সে অস্বীকার করিল না। তাহার পক্ষের বলিবার কথা এই যে সে অমলাকে হত্যা করে নাই বা এই বিষয়ে কোন সাহায্যও করে নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে এ বিষয়ে কিছুই জানিত না। সে যতটুকু জানিত ততটুকু মাত্র বলিল তাহার একটুকু বেশি বলিতে নিজেও সম্মত হইল না উকিলকেও বলিতে দিল না। সে যে হত্যা করে নাই এ বিষয়ে কোনো সাক্ষীও তাহার ছিল না। একজন মাত্র সমস্ত ঘটনা জানেন তিনি তাহার মা। তাহাকে সে প্রাণান্তেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড় করাইতে রাজি হইল না।

পক্ষান্তরে নটবরের দল এমন সব চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহা একেবারে অকাট্য। বিশ্বেশ্বরের উকিল ছটফট করেন। প্রধান সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়া গেল ঘটনার দিন রাত্রি দুটোর সময় অমলার চীৎকার সে শুনিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের বাড়ির কাছেই তাহার বাড়ি। নিশুতি রাত্রে সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে যেন ধস্তাধস্তি চলিতেছে।

এমন ঘটনা উহাদের বাড়িতে নিত্যই হয়, সেজন্য সে ব্যাপারটাকে তেমন গ্রাহ্য করিল না।

বিশ্বেশ্বরের উকিল তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, এই সাক্ষীকে কি জেরা করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বরের তখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। সে জড়িত চক্ষু মেলিয়া উকিলকে বলিল,—এখানে বই-টই পড়ার সুবিধা হয় না?

উকিল হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আসামী কি চায়?

বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—আদালতে বসিয়া থাকিতে তাহার বড় ঘুম পায়। যদি বই পড়ার অনুমতি দেন বড় ভালো হয়।

জজ সাহেব একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর হইতে সাক্ষীরা একে একে আসিয়া হলপ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে তাহাই বলিয়া যায়, কিছুই গোপন করে না। আসামী কাঠগড়ায় একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া বই পড়ে। কোন সাক্ষীকেই তাহার জেরা করিবার কিছুই নাই। উকিল তবু হাল ছাড়েন না। তিনি প্রাণপণে সাক্ষীদের জেরা করেন। কিন্তু ইহারা সাক্ষ্য প্রদান বিষয়ে এতই পক্ক যে বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না। আদালত ভাঙ্গিলে বিশ্বেশ্বর বই মুড়িয়া হাজতে চলিয়া যায়।

সওয়াল জবাবের দিন আসামী পক্ষের উকিল শুধু এইটুক বলিলেন যে আসামী মার্জিতরুচি, শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়। কিন্তু সে যে স্ত্রীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ইহা আসামীকে দেখিলে মোটেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আসামীর স্ত্রীর মৃত্যু রহস্যজনক সন্দেহ নাই। তথাপি আসামী যে তাঁহাকে হত্যা করে নাই, করিতে পারে না ইহা নিঃসন্দেহ। মৃতা হয় আত্মহত্যা করিয়াছেন, নয় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। আসামীর নিজের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেন নাই, করিবার কোনো

কারণও উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় আসামীকে অব্যাহতি দেওয়াই উচিত।

আসামীর দার্শনিক ঔদাসীন্য তাহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া জজেরও সেইরূপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু অতগুলা অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর আসামীকে অব্যাহতি দিতে তিনি পারিলেন না। আসামীর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বিশ্বেশ্বর যেমন বই পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। দণ্ডাদেশ শুনিয়া তাহার বহু অনুরক্ত বন্ধু ও আত্মীয় হাহাকার করিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া গুণেন্দ্রকে কাছে ডাকিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া রেলিং-এর ওদিক হইতে তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল। বিশ্বেশ্বর বোধ হয় দণ্ডাদেশ শুনিতেই পায় নাই। সে চিরদিনের মতো পরম গম্ভীরভাবে হাতের বইখানি দেখাইয়া গুণেন্দ্রকে বলিল, পড়েছ? বড় ভাল বই, পড়ে দেখো।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই দুইজন কনেস্টবল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেণ্ট্রাল জেলে যখন বিশ্বেশ্বর আসিয়া পৌঁছিল তখন সূর্য অস্ত যাইবার আর বেশি বাকী নাই। জেলগেটে ওজন লওয়ার ও দেহখানা তল্লাসীর পর তাহাকে একজন কনেষ্টবল এমনভাবে বীরদর্পে চুয়াল্লিশ নম্বরে লইয়া গেল যে সে যেন এইমাত্র একটা মস্ত যুদ্ধ জিতিয়া আসিল।

তখনও কয়েদীরা ঘরের মধ্যে বন্ধ হয় নাই। সন্ধ্যা হইবার অল্প দেরি। এই সামান্য কয়টি মুহূর্তকে তাহারা যেন অসীম আগ্রহে উপভোগ করিতে চায়। বিশ্বেশ্বরকে তাহাদেরই দ্বারপথে আনিতে দেখিয়া চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর কয়েদীরা নবসঙ্গীসম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে সকল কয়েদীই গভীর ঔৎসুক্যে তাহাকে বিবিধ প্রকার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারিয়া বিশ্বেশ্বর যেমন নীরবে পথ চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে পৌঁছিবামাত্র সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে ঐ এক মিনিটের জন্য। তাহার শান্ত অথচ গম্ভীর মুখশ্রী কমনীয় দেহ এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেখিয়াই বুঝিল এই লোকটি তাহাদের কেহ নয়। তাহাদের চোখে চোখে একটা উপেক্ষার হাসি খেলিয়া গেল। কেবল একটি লোক তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। সে পরম সমাদরে নিজের পাশটিতে তাহার কম্বল বিছাইয়া দিয়া এবং আর একটি কম্বল গায়ে দিবার জন্য ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিল, চট করে নিচে থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ুন। এখুনি দরজা বন্ধ হবে। আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি।

ক্ষুধা বিশ্বেশ্বরের ছিল না। সমস্তদিনের পথশ্রমে ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সে কোনমতে নিচে হইতে হাত মুখ মাথা ধুইয়া

সটান শুইয়া পড়িল। সকলের খাওয়া অনেক আগেই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাশের লোকটি অনেকদিনের পুরানো অধিবাসী। সে সম্ভবত সামান্য কিছু আহার্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর আর চোখ মেলিল না। ওই একখানা ঘরের জন পঁচিশেক কয়েদীর বিবিধ কলরবের মধ্যেই অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরবেলা ঘণ্টি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘুম ভাঙিল। আর সকলেই তখন উঠিয়া আপন আপন কম্বল গুটাইতেছে। সেও কম্বল গুটাইতে লাগিল। পাশের লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—অমন কোরে নয়। দিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কাল সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বিশ্বেশ্বর তাহার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। তাহার অমন শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভাবিতেই পারে নাই লোকটির চেহারা অমন বিশ্রী। গায়ে তামাটে মলিন রঙের উপর মাছের আঁসের মতো দাগ, মুখে মেছেতা, চোখের চারিধারে কালি পড়িয়াছে, হাসিলেই অপরিষ্কার দন্তশ্রেণী বাহির হইয়া পড়ে।

ইহারই পানে সে চাহিয়াছিল। এমন সময় কালো বেঁটে, বলিষ্ঠ-গঠন একটি লোক আসিয়া তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল,—এই, তোমার নাম কি?

—বিশ্বেশ্বর বন্—

কিন্তু জেলে বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনোই মর্যাদা নাই। লোকটি তাহার উপাধি শুনিবার কোনো আগ্রহ না দেখাইয়া আবার তেমনি ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল,—খুন?

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

—মেয়েমানুষ?

বিশ্বেশ্বর সায় দিতেই লোকটা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাহার পিঠে দুটো চাপড় দিয়া বলিল,—ঠিক হ্যায়।

বলিয়াই লোকটা নিচে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বোধ হয় বিশ্বেশ্বরের কমনীয় মুখখানি দেখিয়া তাহার ভালো লাগিয়াছিল। সে তখনই ফিরিয়া আসিয়া একটা বিঁড়ি বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল– দেশলাই আছে?

বলিয়া দেশলাই লইবার জন্য তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া তাহার পাশের লোকটির দিকে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল,—কি বাবা, নবী নওয়াজ, আসামাত্রই?

নবী নওয়াজ লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইয়া লইল। বেঁটে লোকটি আর একবার নবী নওয়াজের দিকে কুশ্রী ইঙ্গিতসূচক হাসি হাসিয়া বিশ্বেশ্বরের পানে ফিরিয়া চাহিয়া প্রসারিত হাতের দুইটি আঙ্গুল অধৈর্যভাবে নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—কই? দেশলাই?

ইহাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া বোকার মতো একবার ইহার দিকে, একবার উহার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছিল। তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছিল না। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—নাই।

ধ্যেৎ! লোকটা বিরক্ত হইয়া গড়্ গড়্ করিয়া নিচে নামিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অন্যমনস্কভাবে বিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নবী নওয়াজ একবার আড় চোখে তাহার দিকে চাহিয়া যেন আপন মনেই বলিল,—এইবার উঠতে হয়েছে।

শীতের রাত্রি। তখনও ভোর হইতে অনেক বাকী। দূরে নেড়া অশ্বত্থ গাছটি বিশীর্ণ, শিরাবহুল বৃদ্ধের মতো অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিতে চলিতে বলিল,—হ্যাঁ। চলুন।

নবী নওয়াজ হাসিয়া বলিল,—আপনার সম্পত্তি রেখে যাচ্ছেন কার জন্যে?

বিশ্বেশ্বর অপ্রস্তুতভাবে জড়ানো কম্বলের পুঁটুলিটি বগলে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইল।

নবী নওয়াজ একটুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া থাকিযা চোখের ইসারায় পূর্বের বেঁটে লোকটির কথা স্মরণ করাইযা দিযা চুপি চুপি বলিল,—কোকেন।

ইসারাটুকু বিশ্বেশ্বর ঠিক বুঝিল না। বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোকেন কি?

নবী নওয়াজ চারিদিকে সন্তর্পণে চাহিয়া লইল। সবাই তখন নিচে নামিযা গিযাছে। সে বিশ্বেশ্বরের আরও কাছে সরিযা আসিযা তাহার কম্বলেব জামাটাব বোতাম নাড়িতে নাড়িতে চুপি চুপি বলিল,—যে লোকটির সঙ্গে এক্ষুনি কথা কইলেন না?—নাটু ওর নাম--লোকটা কোকেন-চোর। ভীষণ লোক।

ঠিক সেই সময নাটু তব্ তব্ করিয়া সিঁড়ি বহিযা উঠিতে উঠিতে নবী নওযাজের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিযা হাসিযা চীৎকাব করিয়া উঠিল--ঠিক হ্যায়! ঠিক হ্যায়!

নবী নওযাজ তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুতভাবে বিশ্বেশ্বরকে লইযা নিচে নামিয়া গেল।

সম্মুখেব উঠানেব উপর একটা বেদীর মতো খানিকটা স্থান উঁচু করা। তাহারই উপব অগভীর ছয়টি নালী। কল খুলিয়া দিলেই তিনটি নালী জলে ভর্তি হয। এই সামান্য জলেই অত লোকের স্নান, আচমন, বাসনমাজা, কাপড় কাচা সম্পন্ন করিতে হয। এই তিনটি নালীর পাশে পাশে আবার একটি করিয়া নালী,—জলনিকাশের জন্য।

ইহারই কাছে অনুচ্চ করোগেটেড্ টিন দিযা ঘের-দেওযা পাযখানা। একটি হাতখানেক উঁচু করোগেটেড শীটের দুপাশে কয়েকটি করিয়া পায়খানা। একটিতে বসিলে অপরগুলি নজরে পড়ে।

কোনরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেই লাইনবন্দী হইবার সময় হইল।

সারবন্দী হইয়া সকলে থালা লইয়া সম্মুখের গাছতলায় বসিতেই একজন কয়েদী আসিয়া সকলকে লাপ্‌সী পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল। মহা-কলরবে পরম পরিতোষের সঙ্গে সেই অপূর্ব দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার পর বাসনমাজার পালা।

বাসন মাজিতে মাজিতে নবী নওয়াজ বলিল,- আপনাকে বোধ হয আজকে আর কিছু করতে হবে না।

বিশ্বেশ্বর বোধ হয অন্য কথা ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল — না।

—তাহলে সেই আবার দুপুব বেলা দেখা হবে।

বিশ্বেশ্বব অন্যমনস্কভাবেই বলিল,—হুঁ।

আবার ঘণ্টা বাজিল। সবাই সাববন্দী হইয়া নিজেব নিজের কাজেব ঘরে চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বব তাহার সেই মস্ত বড় হল-ঘরে যাইয়া আবার কম্বল বিছাইয়া শুইযা পড়িল। পাহাবাওযালা আসিয়া দরজা তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলায আব একবাব সবাই হৈ-চৈ করিতে কবিতে আসিল। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে স্নান, আহার ও বাসন মাজা সারিয়া গল্প করিবার সময় বড় থাকে না। তবু উহারই মধ্যে নবী নওয়াজ কযেকবাব বিশ্বেশ্বরের কাছে কাছে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরেব মন তখন বহু দূরে এলোমেলো ভাবে ঘুরিতেছিল। নবী নওয়াজকে বড় একটা লক্ষ্যই করিল না।

সন্ধ্যার আহারাদির পর নবী নওয়াজ বিশ্বেশ্বরের বিছানাটি যত্ন করিযা পাতিয়া দিল। নিজেরটিও তাহারই পাশে পাতিয়া লইযা শুইযা পড়িল। বিশ্বেশ্বর তথাপি কোনো কথাই কহিল না। একখানি হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া নিস্পন্দ ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ উস্‌খুস্‌ করিয়া নবী নওয়াজ এক সময় ডাকিল,—ঘুমুলেন না কি?

ঘুমাইবার কথা নয়। ঘরের মধ্যে তখন হাসি ও গল্পের তুমুল হর্‌রা চলিতেছে। বিশ্বেশ্বর চোখ মেলিয়া তাহার পানে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আচ্ছা, বাড়িতে তোমার আর কে আছে?

এই প্রসঙ্গে নবী নওয়াজ সহজে নামিতে চায় না। কিন্তু একবার কথা উঠিলে আর থামিতেও পারে না। তার পরে সমস্ত রাত্রি আর ঘুম হয় না। চোখের সামনে দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মতো তাহার বৃদ্ধা জননী, বিরহিণী স্ত্রী ভাসিতে ভাসিতে মিলাইয়া যায়, ডুরেশাড়ীপরা মেয়েটি যেন মল বাজাইয়া পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, কচি ছেলেটি দোলায় শুইয়া শুইয়া তাহার দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চায় আর হাসে। নবী নওয়াজের বুকের ভিতরটা অসহ্য ব্যথায় মোচড় দিয়া ওঠে। মনে হয়, আজকের রাত্রে একটি মিনিটের জন্যে যদি সে একবার ছুটি পায়! তাহার বিনিময়ে সে সর্বস্ব দিতে পারে। সে তো হইবার নয়। লাথি মারিয়া এই জানালার গবাদে, ওই উঁচু পাঁচিল যদি সে ভাঙ্গিয়া ধূলায় মিশাইয়া দিতে পারিত!

এই প্রসঙ্গ উঠিলে নবী নওয়াজের মাথা গরম হইয়া ওঠে।

শীতের রাত্রেও জেলঘরের জানালা খোলা থাকে। কে কখন সরিয়া পড়ে তাহার স্থিরতা তো নাই। পাহারাওয়ালা জানালা দিয়া গণিয়া গণিয়া দেখে, সব ঠিক আছে কি না।

তবু তাহাদের চোখে ধূলা দিয়াও কয়েদী পালায়।

বিশ্বেশ্বর খোলা জানালা দিয়া নেড়া অশ্বত্থ গাছটির পানে চাহিয়াছিল। আবার ডাকিল,- নবী নওয়াজ!

—আজ্ঞে।

-তুমি নেই, তোমার বাড়ির লোকের খাওয়া-পরা চলছে কি ক'রে?

নবী নওয়াজ কথা কহিল না, শুধু খোদার উদ্দেশে আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর সেদিকে চাহিয়াও দেখিল না। আবার প্রশ্ন করিল, কি ক'রেছিলে তুমি?

—খুন।

—খুন? তুমি খুন ক'রেছিলে?—

বিশ্বেশ্বর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নবী নওয়াজের মুখের দিকে চাহিয়া সেই স্বল্পালোকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। নবী নওয়াজ কিন্তু যেমন অসাড় ভাবে শুইয়াছিল, তেমনি শুইয়া রহিল, এতটুকু বিব্রত হইল না।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তুমি খুন করেছ? খুন করতে পারো তুমি? তোমাকে দেখে—

এবারে নবী নওয়াজ হাসিয়া বলিল,—আপনিও তো খুন ক'রেই এসেছেন। আপনাকেও তো দেখে মনে হয় না—

বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত ভাবে বিছানায় একটা চাপড় দিয়া বলিল,—আমি খুন করিনি। ওরা আমায় মিথ্যে জড়িয়েছে।

নবী নওয়াজ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ হয় নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—আমায় কিন্তু মিথ্যে জড়ায় নি। আমি সত্যই খুন ক'রেছিলাম।

নবী নওয়াজ আস্তে আস্তে কপালে হাত রাখিয়া সম্ভবত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল।

বিশ্বেশ্বরের কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই শান্ত, নিরীহ, নির্বিরোধ লোকটি কোনো কারণেই কাহাকেও হত্যা করিতে পারে। ইহার চোখ দুটি দেখিয়া সে কথা বিশ্বাস হয় না। এই পৃথিবী যাহার আর কোনো প্রয়োজনেই আসিবে না সে যেমন করিয়া পৃথিবীর পথে চলে এই লোকটির চলিবার ভঙ্গি সেইরূপ। অথচ ইহার মনটি যেন স্নেহ-রসে টলমল। এমন লোক কখনও খুন করিতে পারে? বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে নির্বাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নবী নওয়াজ আরও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। তাহার মুদ্রিত চোখের কোণ বহিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল, স্বল্পালোকে তাহা ভালো দেখা গেল না। সুদীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এমন করিয়া তাহার মনের কথা কেহ জানিতে চাহে নাই। এই স্নেহপরায়ণ তরুণের কাছে সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার বেদনাতুর মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্তরের নিরুদ্ধ জ্বালা সে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

ওপাশে অন্য কয়েদীর কল-কোলাহল ও কুৎসিত রসিকতা তখনও শেষ হয় নাই। বাহিরে গুটিকয় পারাবত শুইবার স্থান লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝটাপটি করিতেছিল। তাহাদের ওয়ার্ডের পাহারাওয়ালা চীৎকার করিয়া উপরওয়ালাকে কয়েদীর সংখ্যা যে ঠিক আছে তাহা জানাইয়া দিল।

[৩]

নবী নওয়াজ যাহা বলিল, তাহার মর্ম নিম্নলিখিতরূপ,—

গ্রামখানি বড় নয়, ছোটই। এবং ছোট বলিয়াই নবী নওয়াজদের আয়মাদাবী ছোট হইলেও প্রতাপ ছিল অসম্ভব বকম বেশি,—অত্যন্ত দুর্দান্ত, অথচ অত্যন্ত সহজ।

শিক্ষায়-দীক্ষায়-সভ্যতায় গ্রামে মানুষ বলিতে একজনও ছিল না।

নবী নওয়াজদেরই দলিজে মোবারক মিঞা একটা মক্তাব মতন খুলিয়াছিল। মোবারকেব বাড়ি ওখানে নয় বটে, কিন্তু কাছেই। নিজে সে নবী নওয়াজদের বাড়িতেই 'তার্বাবিলিম' থাকিত, সুতরাং খাওয়ার খবচ ছিল না। তাব উপর পাঁচ বাড়ি হইতে ছেলেদেব মাহিনা বাবদ টাকাটা-সিকিটা, এবং আলু-মূলা-চা'ল-ডা'ল পাঁচ বকম মিলিত। ইহাব সমস্তটুকুই সে বাড়ি পাঠাইয়া দিত।

এই মোবারকের নিজের বিদ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু দুলিয়া দুলিয়া সেইটুকু আয়ত্ত করিতেই গ্রামের ছেলেদের ষোলোটা বছর পাব হইয়া যাইত। সকালে-বিকালে মক্তাব; তামাকে-বিড়িতে এবং আরও বিবিধ প্রকারে পরিপক্ক হইবার ছেলেদের যথেষ্টই অবসব মিলিত। সুতরাং ষোলো বছর পরে মোবারকের মক্তাব হইতে যাহারা বাহির হইত, তাহারা একেবারে সাবালক হইয়াই বাহির হইত।

এই মক্তাবে নবী নওয়াজ নিজে পড়িয়াছে, তাহার দাদা পড়িয়াছে এবং তাহার ছোট ভাইও পড়িত। গ্রামের মধ্যে যে কয়টি লোকের অক্ষব-পরিচয় হইয়াছে তাহারা সকলেই এই একই কারখানায় প্রস্তুত। কিন্তু সে অক্ষর-পরিচয় এতই স্বল্প যে, নিরক্ষরদের সঙ্গে পার্থক্য অতি সামান্যই।

এই সামান্য পার্থক্য লইয়া অহংকার করা চলে না। সে অহংকার নবী নওয়াজ করিতও না। আহারে-বিহারে, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে নবী নওয়াজ কোনোদিনই দূরত্ব রাখিয়া চলিত না। প্রতিবেশিদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই তাহাদের প্রতাপ ছিল অখণ্ড।

নবী নওয়াজদের আয়মাটুকু অনেক কালের। তাহার নিজের বিশ্বাস, বহু পুরাকালের কোনো নবাব তাহার কোনো পূর্বপুরুষের অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এই আয়মা দান করেন। সে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আর মেলে না, আয়মাটিও ক্ষইয়া ক্ষইয়া এইটুকুতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যাহা বস্তু নয়, যাহা নীলিমার মতো ফাঁকি তাহাই ইহাদের রক্তে অক্ষয় হইয়া আছে। অতীত গৌরবের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তাহারই কাহিনী সত্যে-মিথ্যায় মিশিয়া ইহাদের সকলেরই মনে-মনে পুঞ্জিত হইয়া আছে।

হৃত সম্পত্তির কিছু ফিরাইয়াছিলেন নবী নওয়াজের বাবা। প্রখর বিষয়-বুদ্ধির সাহায্যে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। অনেক সংকল্পও তাঁহার ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ইচ্ছাই সফল করিবার সময় পাইলেন না। অধিকন্তু সেই অর্থ যাহাদের জন্য তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহাদের একটির বয়স তখন ষোলো, আর একটির বারো এবং সর্বকনিষ্ঠটি একেবারেই শিশু।

এই দুঃসময়ে মোবারক মিঞা নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত বোঝা না তুলিয়া লইলে বিধবা জননী নাবালক ছেলে কয়টিকে লইয়া একেবারে অকূলে ভাসিতেন। লেখাপড়া শিখে নাই বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের আইনের বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ম যে, ধাক্কা সামলানো বিধবার পক্ষে অসম্ভব হইত। যাহারা টাকা ধার লইয়াছিল তাহারা ধার অস্বীকার করিল, দেখিতে দেখিতে অনেকগুলো জাল হ্যাণ্ডনোটও তৈরি হইয়া গেল, এবং একবৎসরের মধ্যে দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে ছোট-বড় দশ-বারোটা মামলা নবী নওয়াজদের বিরুদ্ধে দায়ের হইয়া গেল।

বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র মোবারক মিঞারও ছিল না। কিন্তু তাহার

মস্ত বড় সাহস লইয়া সে সর্বক্ষণ নবী নওয়াজের বড় ভাই দীন মহাম্মদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে। বছর পাঁচেক পরে ফল হইল যে, মোবারক সেই মোবারকই রহিয়া গেল, কিন্তু মামলা করিতে দীন মহাম্মদেব জোড়া ও-অঞ্চলে আর কেহ রহিল না।

নবী নওযজ তখন ছোট, এবং সোলেমান তো আরও ছোট। ব্যস্তবাগীশ বড় দাদাটিকে দেখিযা তাহাব বিস্ময় লাগিত। রান্না শেষ হইতে হয়তো আর তিন মিনিট দেরি অছে, কিন্তু দীন মহাম্মদের ততটুকু অপেক্ষা কবিবাবও তর সহিত না। সেটুকু সময় অপেক্ষা করিলে যে ট্রেণ ফেল হইয়া যাইবে এমনও নয। তথাপি কলের ব্যাপার। এই যাঃ! বলিলেই সদরেব মমলার দফা শেষ হইয়া যাইবে। দীন মহাম্মদ না খাইয়াই অধিকাংশ দিন চলিয়া যাইত। অথচ পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব জাহিব করিবার জন্য দীন মহাম্মদ মোটেই চেষ্টা করিত না। না-খাওযার ব্যাপাব লইয়াও কোনদিন সমাবোহ করিত না। মমলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র লইযাই সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, ইংরাজিতে যাহাকে 'সীন ক্রিয়েট্' করা বলে, তাহার সময়ও মিলিত না। স্বভাবত সে নির্বিবোধ ছিল। বাইশ বছর বয়সেই সে হৈ-চৈ করাটা ছেলেমি মনে করিত। আইনেব প্যাঁচ কষিয়া মামলা জেতা ছাড়া পৃথিবীর আব কোনো বিষযে তাহাব আগ্রহও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না।

এই অগ্রজটির প্রতি নবী নওয়াজের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। মক্তব ছাড়ার পর নিজে সে চাষ-বাস, গরু-বাছুর, মুনিস-রাখালের তত্ত্বাবধান করিত। আইন-আদালতের ব্যাপারটি কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। দাদার অতটুকু ছোট মাথার মধ্যে কি করিয়া অত সব গোলমেলে ব্যাপারেব স্থান সংকুলান হইয়াছে ইহা ভাবিতেই সে দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত। দাদার খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া সোরগোল করিয়া বাড়ির মেয়েদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত সে-ই। এবং যেদিন দাদাকে না খাইয়াই সদরে

মামলা করিতে যাইতে হইত সেদিন আর সে বাড়িতে কাক-চিল বসিতে দিত না।

কোনো হাঙ্গামে থাকিত না সোলেমান। পাশা এবং গান-বাজনার নেশটা বেশি ছিল বলিয়া মক্তাবের বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সে বেশি সময় নষ্ট করে নাই। সকালে উঠিয়া খানিকটা কাঁচা দুধ পান করিয়া সে আড্ডা দিতে বাহির হইত, ফিরিত বেলা একটায়। তারপরে দুইটা আড়াইটার মধ্যে সাত-তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু নাকে-মুখে গুঁজিয়া সেই যে বাহির হইত, ফিরিত রাত্রি বারোটায়।

প্রতিবেশিগণ মাঝে মাঝে আসিয়া নালিশও জানাইয়া যাইত,—ওহে নবী নওয়াজ, সোলেমানটার দিকে একটু নজর রেখো। ওটা যে একেবারে খারাপ হ'য়ে যেতে ব'সেছে।

প্রতিবেশিরা নিতান্ত মিথ্যা বলিত না। যে পাড়ায় সোলেমানের আড্ডা সেই পাড়ায় তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলিয়াই নিজের দলিজ ছাড়িয়া অত দূরে যাইত। কিন্তু নিতান্ত বদ্‌মেজাজি বলিয়া এই খবরটি নবী নওয়াজের কানে তুলিতে কেহ সাহস করে নাই।

সে হাসিয়া বলিত,—কি আর ও করবে মাইতোব মিঞা? বড় ভাই আছে, আমি আছি, ও যে-ক'দিন পারে হেসে-খেলেই বেড়াক। এ সব ঝঞ্ঝাটে যত না আসা যায় ততই ভালো। এই দেখ না, বড় ভাই আজ না খেয়েই গেল চ'লে। আমাদের জন্যেই তো। নইলে—

কিন্তু মাইতোব মিঞা সেদিন বিশেষ কারণেই আসিয়াছিল। মোড়াটা খুঁটির কাছে সরাইয়া আনিয়া নবী নওয়াজের হাতের ফরসি টানিয়া লইয়া প্রথম কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ইত্যবসরে নবী নওয়াজ বড় ভাই সংসারের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতেছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়া বলিল,—এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে প্রাণ ধ'রে কেউ মায়ের পেটের ভাইকে নামাতে পারে? তুমিই বল।

বলিয়া মাইতোর মিঞার মন্তব্য শুনিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাইতোর মিঞা এতক্ষণে চোখ মেলিল। বলিল,—আমি বলি, ওব একটা বিয়ে-থা দাও।

নবী নওযাজের বিশ্বাস, এই শুভ-কর্মটি তাহাবই সেরেস্তাব অন্তর্গত। এইরূপ ব্যাপারে তাহার উৎসাহ অনন্ত। সে মোড়াটা একেবারে মাইতোব মিঞার সন্নিকটে টানিযা আনিযা বলিল,—সেই চেষ্টাই কবছি। পাহাড়পুরেব মাজমুম মিঞার লাৎনীব সঙ্গে। কিন্তু ছোঁড়াটা কেমন যেন স'বে স'বে বেড়াচ্ছে। তোমাদের কথা তো শোনে ও। দেখ না একবার চেষ্টা ক'রে।

মাইতোর মিঞার ঠোঁটের কোণে একটু কৌতুকেব হাসি খেলিযা গেল। কেন যে সে সরিযা সরিযা বেড়ায় সেই কথাটা জানাইবার জন্যই তাহার আসা।

সে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—আমি বলি, রহিম খাঁযের মেযের সঙ্গে হ'লে কেমন হয়?

প্রস্তাব শুনিয়া নবী নওয়াজ যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল বলিল, বল কি মাইতোব মিঞা? নিকে?

মাইতোব মিঞাব বলিবাব ইচ্ছা ছিল, ক্ষতি কি? কিন্তু বদ্‌মেজাজী নবী নওয়াজেব মুখ-চোখেব অবস্থা দেখিযা সে-কথা আর বলিতে ভরসা পাইল না।

নবী নওযাজ বলিল,—সে হয না, মাইতোব মিঞা। তাব চেযে আমি যা বল্‌লাম, তাই দেখ।

সুতবাং রহিম খাঁব বিধবা কন্যার সহিত নিকাব প্রস্তাব এইখানেই শেষ হইয়া গেল। কথাটা যথাসময়ে সোলেমানের কাছেও পেঁীছিল। সে মনে মনে গর্জন করিল,—আচ্ছা।

কিন্তু মনের ক্রোধ মনেই রাখিতে হইল। বিপুল বলশালী বলিয়া নয়, অগ্রজ বলিয়াই তাহার কাছে নিজের মনের বাসনা জানাইবার মতো বুকের পাটা তার ছিল না। নিরুপদ্রব দাদাকে নবী নওয়াজ অত্যন্ত ভক্তি করিত বলিয়াই, বোধ হয়, ছোট ভাই-এর কাছ হইতে ভক্তির দাবী করিতে তাহার উপদ্রবের অবধি ছিল না। ছোট ভায়ের খাওয়া-পরা, এমন কি বিলাসিতার পর্যন্ত এতটুকু অভাব সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া নবী নওয়াজের কথার এতটুকু প্রতিবাদ করিলে দাদা তাহা ক্ষমা করিবে এমন ভরসা সাবালক হইয়াও সোলেমান করিতে পারিত না। সুতরাং সে চুপ করিয়াই রহিল।

তারপরে অনেক দিন কাটিয়া গেল। মাজুম মিঞার পৌত্রীর সহিত বিবাহও অতি তুচ্ছ কারণেই একদিন ভাঙ্গিয়া গেল। এবং মাজুম মিঞাকে এক হাত দেখিয়া লইবার জন্য বদরগঞ্জের বিখ্যাত আলি হোসেনের মেয়ের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সোলেমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমান লোকের কল্পনা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে লাগিল। তাহারা প্রাণপণে সোলেমানের কান ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। বুঝাইয়া দিল, বিষয় নবী নওয়াজের একার নয়, সোলেমানেরও তাহাতে সমান অংশ আছে। ইচ্ছা করিলেই মামলা করিয়া চুল চিরিয়া নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে পারে।

সোলেমান বলে, ঠিকই তো।

তাহারা বলে, সোলেমান এখন সাবালক হইয়াছে। সে যাহাকে খুসী বিবাহ করিতে পারে। দাদাদের তাহাতে বলিবার কোনো অধিকার নাই।

সোলেমান সোল্লাসে বলে, নিশ্চয়ই।

তাহারা আরও বলে, বদরগঞ্জের যে-মেয়েটির সঙ্গে বিবাহের কথা হইতেছে, সেটি যেমন কালো তেমনি কুৎসিত, ইহা তাহাদের স্বচক্ষে দেখা। বড় বংশের মেয়ে আসিয়া কি বেহেস্ত হাতে তুলিয়া দিবে? ইহার উপর,

মেয়েটির বয়স নয় বৎসরের বেশি নয়। এই বৃদ্ধ বয়সে (তখন সোলেমানের বয়স ষোলো) সোলেমান কি কচি খুকীকে পলিতায় করিয়া দুধ খাওয়াইবে?

সোলেমান রাগের মাথায় নবী নওয়াজের বিরুদ্ধে মুখে যা' আসে বলিযা যায। লোকে মুখ টিপিয়া টিপিযা হাসে। তা হাসুক। কিন্তু এত কান ভাঙ্গাভাঙ্গি সত্ত্বেও সোলেমান দাদার দিকে মুখ তুলিযা চাহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। নবী নওযাজ পূর্ববৎ বিবাহের সম্বন্ধ চালাইতে লাগিল। তবু গ্রামের লোকের আনন্দ আর ধরে না। বলে, একটা মস্ত বড় সম্পত্তিবিচ্ছেদের মামলা বাঁধিবার আর দেরি নাই। এমন কি নবী নওযাজের বলিষ্ঠ দেহের কথা ভাবিয়া একটা খুনো-খুনির আশঙ্কা পর্যন্ত মনে উঠে।

মস্ত বড় সম্পত্তিবিচ্ছেদের মামলা বাঁধিল না বটে, কিন্তু খুনো-খুনির আশঙ্কাটা মিথ্যা হইল না। তবে তাহার সহিত এই ঘটনার কোনো সম্বন্ধ নাই। ঘটনাটা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং এত তুচ্ছ উপলক্ষে একটা খুন হইয়া যাইতে পারে এ কথা মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে না। তথাপি এই তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিযাই একটি মানুষের সাধ আকাঙ্ক্ষা, হাসি ও আনন্দ চিরদিনের মতো শেষ হইযা গেল।

আগের রাত্রে পাশা খেলায় চার বাজি হারিয়া আসিযা সোলেমান সমস্ত রাত চোখের পাতা বুজে নাই। সকালে সেই চার বাজি শোধ না দেওযা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছিল না।

তখনও বেশ ভোর হয় নাই। দীন মহাম্মদ ও নবী নওয়াজ দলিজের দাওযায় বসিয়া বদ্‌না লইযা মুখ ধুইতেছিল। দীন মহাম্মদ আগের রাত্রে সদর হইতে ফিরিয়াছে। মনটা তাহার ভালো নাই। ও-পাড়ার ইয়াকুব তাহারই পয়সায় সদরে গিয়া তাহারই বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। ইয়াকুবের পক্ষে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সাক্ষ্য দেওয়া তাহার পেশা।

যাহার কাছ হইতে বেশি টাকা পাওয়া যায়, তাহারই পক্ষে সে সাক্ষ্য দেয়। ইহা দীন মহাম্মদ না জানিত তাহা নয়। কিন্তু টাকাকড়ির সমস্ত ব্যাপার ঠিক হইয়া যাওয়ার পর সে যে সদরে পা দিয়াই আরও দাঁও কসিবার চেষ্টায় বাঁকিয়া বসিল, ইহাতেই তাহার জেদ চড়িয়া গেল। সে সোজা বলিয়া দিল, ইয়াকুবকে সে আর একটি পয়সাও দিবে না, ইহাতে সে সাক্ষ্য দিক্, আর নাই দিক্।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া দীন মহাম্মদ স্থির করিল, একখানা জাল হ্যাণ্ড নোট তৈরি করিয়া ইয়াকুবকে একবার হাইকোর্ট দেখাইয়া আনিতে না পারিলে সে সায়েস্তা হইবে না। এইজন্য বাইগ্রামের জয়হরি ঘোষকে আজই তাহার বিশেষ প্রয়োজন। চাকরের হাতে চিঠি পাঠাইয়াও তাহাকে আনাইতে পারা যায়। কিন্তু কাজটা কাঁচা কাজ হইবে। জয়হরিকেও তো বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং নিজেদের কাহাকেও যাইতে হয়।

নবী নওয়াজ বলিল, এই তো রাইগাঁ। কতটুকুই বা পথ! সোলেমান বরং ঘোড়াটা নিয়ে একবার যাক্। জলখাবারের বেলা হ'তে না হ'তে ফিরে আসবে।

এমন সময় সোলেমান চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল।

—এই তো সোলেমান! ওরে, ঘোড়াটা নিয়ে একবার যা তো বাইগা। বিশেষ দরকার। জয়হরি ঘোষকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি।

গ্রহের ফের! যে সোলেমান অত বড় ব্যাপার লইয়া দাদাদের মুখের সামনে একটা কথা বলিতে সাহস করে নাই, সামান্য পাশা খেলায় তাহার এমনই বুদ্ধিভ্রংশ হইল যে, সটান তাহাদের মুখের উপর বলিয়া বসিল,—আমি পারবো না।

গ্রহের ফের বই কি! এই সামান্য কথায় নবী নওয়াজ গর্জন করিয়া উঠিল—কি? কি বললি?

সোলেমান আরও জোরে চেঁচাইয়া বলিল,—আমি পারবো না।

চক্ষের পলকে নবী নওয়াজের হাতের বদনা বিপুল বেগে সোলেমানের

রগে গিয়া লাগিল, এবং "মা গো" বলিয়া সেই যে সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিল না।

এই পর্যন্ত বলিয়াই নবী নওয়াজ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর বলিতে পারিল না।

তাহার কান্নায় পাশের একটি কয়েদীর বোধ হয় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—জ্বালালে!

[৪]

এই পৃথিবী যেন বিধাতার খেলাঘর। রক্ত-মাংসের মানুষ লইয়া নিরন্তর কি নিষ্ঠুর খেলাই না চলিতেছে! ছোট ছেলে কাচের পুতুলকে আদর করিতে করিতে নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই যেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে,—বুকে এতটুকুও ব্যথা বাজে না,—তেমনি করিয়া মানুষকে লইয়া অহরহই তাঁহার খেলা চলিতেছে। কিন্তু কেন?

নবী নওয়াজের চোখের জল তখনও অঝোরে ঝরিতেছিল। একটা চাপা-কান্না অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহার বুকের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় বিলীন হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মন তখন এই ঘর, এই পৃথিবী, ঊর্ধ্বের অনন্ত আকাশ ছাড়াইয়া বহুদূরে উড়িয়া চলিতেছিল

এই বিপুল পৃথিবী,—এমনই কোটি কোটি গ্রহ কল্পনাতীত বিশাল একটা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছে—ওই মঙ্গল—ওই বুধ—ওই বৃহস্পতি ওই শনিগ্রহ পলকের মধ্যে চোখের সুমুখ দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল,—এক-একটা সূর্য আগুনের পিণ্ডের মতো ছুটিয়া চলিয়াছে—এমনি কোটি কোটি সূর্য,—সংখ্যা নাই, শেষ নাই, কেবলই ছুটিতেছে—তারপরে? স্থান নাই, কাল নাই, আলো নাই, অন্ধকার নাই,—

বিশ্বেশ্বরের চোখের সুমুখ হইতে সমস্ত দৃশ্য একেবারে অবলুপ্ত হইয়া গেল,—এত বড় বিরাট জগতের মধ্যে একটি মানুষকে সে কল্পনাতেই আনিতে পারিল না। অত বড় গ্রহ হইতে একটি কীটাণুসৃষ্টি পর্যন্ত সমস্তই সেই বিধাতার খেলা। কিন্তু এই খেলা কেন? অত বড় গ্রহ সৃষ্টি করিবারই বা অর্থ কি, অত ক্ষুদ্র কীটাণু সৃষ্টি করিবারই বা সার্থকতা কি?

বিশ্বেশ্বর ভাবিতেছিল,—এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে মানুষ তাহার

খেলাঘর পাতিয়াছে। এই সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে সে গড়িয়া তুলিয়াছে,--"আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার গ্রাম, আমার দেশ।" এবং তাই লইয়া মারামারি কাটাকাটির শেষ নাই। যাহার নিজের পরমায়ু অতি অল্প, দু'চোখে যাহা পড়ে তারই উপর তাহার অধিকারবোধ অপরিসীম; বিধাতার চোখের উপর সে আজ দ্বিতীয় বিধাতা সাজিয়া বসিয়াছে। একটি মানুষ অপর মানুষের জন্য নীতি গড়ে, বিধান দেয়, শাসন করে, শাস্তি ও শৃঙ্খলার বেড়াজাল রচে। অদৃশ্যে বসিয়া হয় তো বিধাতা এই ভঙ্গুর প্রাণীর দম্ভ দেখিয়া হাসেন!

ঘরের ও-কোণে তখন দু'টি কয়েদীর মধ্যে নিগূঢ় ফিস্-ফাস্ চলিতেছিল। মহিম স্পেশাল ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের "ফাল্তু;"—সকালে উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের চা-তৈরি করা হইতে বাসন মাজা পর্যন্ত সকল রকমে পরিচর্যা করে। লোকটি নারীহরণ ঘটিত কি-একটা অপরাধে মোটা রকম সশ্রম কারাদণ্ড ভুগিতেছে। "ফাল্তুগিরি" তাহার কারাদণ্ডের সশ্রম অংশ। তাহার অবস্থা অন্য কয়েদীদের চেয়ে অনেকটা ভালো। রাজবন্দীদের চোখে-চোখে একটু যত্নেই থাকে, অর্থাৎ রাজবন্দীদের দেওয়া তেলটা-সাবানটা গায়ে মাখিতে পায়, এবং জেলে সব চেয়ে যা দুষ্প্রাপ্য সেই বিড়ির তাহার অভাব নাই।

এমন অবস্থাতেও মহিম একটা দুষ্কর্ম করিয়া বসিয়াছে। বেন্টো-গাঁটকাটার সহিত সেই পরামর্শই চলিতেছিল। রাজবন্দীর সোনার বোতামটি সে চুরি করিত না, চুরি করা তাহার অভ্যাসও নাই। কয়দিন হইতেই কখনও টেবিলের উপর, কখনও বালিশের নিচে, কখনও বা বইগুলির ফাঁকে বোতাম-সেটটি দেখিয়া আসিতেছে,—কোনো দিন লোভ হয় নাই। তাহার দুর্মতি, একদিন [illegible] অসাবধানতা-প্রসঙ্গে এবং নিজের সততা প্রমাণের জন্য এই কথা বেন্টো-গাঁটকাটার নিকট উল্লেখ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে

বেন্টোর ক্রমাগত প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত সে আর লোভ সামলাইতে পারিল না।

বেন্টো পাকা লোক। সতেরো বৎসর বয়স হইতে জেল খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। দুই মাসও বাহিরে বসিয়া থাকে না, আবার জেলে ফিরিয়া আসে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, জেলেই তার রোজগার হয় বেশি। মেয়াদও তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—আর মাস চারেক বাকি। সুতরাং উপার্জন সম্বন্ধে তৎপরতা আরও বাড়িয়াছে। বিশেষ, কিছু দিন পূর্বে তাহার বালক-পুত্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে, কয়দিন হইতে তাহার জননী ও ভগিনীর সন্ধান মিলিতেছে না। বেচারী নিরাশ্রয়ের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঘটনায় যে দুই জনের উপর তাহার সন্দেহ হয়, তাহাদের নামও সে বলিয়া গিয়াছে।

ছেলেটি আপশোষ করিয়া বলিয়াছে,—কি বল্‌বো বাবা, আমি ছেলে মানুষ, গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে পারবো না। কিন্তু অন্ধকারে বাগ্‌মতো যাকে পাবো, তাকে আর—

পিতা সোৎসাহে ছেলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল,—আর চার মাস রে ব্যাটা, চার মাস সবুর কর্‌। তারপর বাপ-ব্যাটা এক সঙ্গে জেল খাটবো—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ছেলে পরমোল্লাসে হাসিয়াছিল। জেলে যখনই সে দেখা করিতে আসিয়াছে, বাপের কাছ হইতে যে টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমস্ত সংসারের তিন মাস রাজার হালে চলিয়া যায়। জেলের মধ্যে তাহার পিতার তেজারতী কারবার আছে তাহাও সে শুনিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারে জেলের উপর তাহার একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

বেন্টোর নিজের চরিত্র সম্বন্ধে কোনো উচ্চ ধারণা নাই। তাহার জীবনে সে নিজের স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া অনেকবার অপরের স্ত্রী ও কন্যা লইয়া উধাও হইয়াছে। কতদিন স্ত্রীর চোখের সম্মুখেই নিজের শয়নকক্ষে পরস্ত্রী লইয়া তাণ্ডবলীলা করিয়াছে। যে পল্লীতে সে থাকে,

সেখানে কোনো পুরুষ এবং কোনো স্ত্রীলোকই চরিত্র লইয়া অহংকার করে না। নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে বিশেষ শ্রদ্ধাবান নহে। কতদিন অকস্মাৎ বাড়ি ঢুকিয়াই সে দেখিয়াছে, উঠানের এক কোণে বেড়া দিয়া ঘেরা রান্নাঘরখানির মধ্যে তাহার দিকে পেছন ফিরিয়া বসিয়া তাহার স্ত্রী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, এবং বেড়ার ওধারের লোকটি তাহাকে দেখিয়াই চট্ করিয়া সরিয়া গেল। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সে অনেক সময় এসব দেখিয়াও দেখে নাই।

কতদিন তাহার স্ত্রী সকল অপরাধ প্রকাশ্যভাবে এবং সগর্বে স্বীকার করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিয়াছে। তথাপি সে নিষ্কৃতি দেয় নাই। হয়তো ভালোবাসার জন্য নয়,—সে বুঝিয়াছে, পরস্ত্রী লইয়া দুইদশ দিন স্ফূর্তি করা চলে, কিন্তু সময়ে-অসময়ে দুমুঠো ভাতে-ভাত ফুটাইয়া দিবার জন্য একজন স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো, নীড় বাঁধিবার মোহ তাহারও মনের গভীরে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। কে জানে, হয়তো বাঁধা নীড়ে ঘা পড়াতেই আজ তাহার সমস্ত অন্তর প্রতিহিংসাগ্রহণে এমনি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে!

তখনও তাহার ছেলে আসিয়া নিদারুণ সংবাদ দিয়া যায় নাই। প্রত্যহ রাত্রে মনে-মনে আপনার সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়াছে,- জেল হইতে বাহির হইয়া কোন্ প্রেয়সীর জন্য কি চাই। প্রত্যহ একবার নূতন করিয়া হিসাব করা চাই। রঙ্গিণীর বয়স হইয়াছে, তবু তাহার ডুরে শাড়ী পরিবার লোভ যায় নাই; তাহার জন্য ভালো দেখিয়া একখানি ডুরে শাড়ী কিনিতে হইবে। পেভাতির কাঁচা বয়স, সহজে কাছে ঘেঁসিতে চায় না, ছল করিয়া কেবলি চোখে-চোখে দূরে দূরে ফেরে। তাহার জন্য কি দিলে ঠিক শোভন হয়, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। তখন তার নিজের স্ত্রীর কথা মনেই পড়িত না। এখন মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। ধরা পড়িবার ঠিক আগের দিন। শীঘ্রই ছাড়াইয়া আনিবে বলিয়া দিনের অন্নসংস্থানের জন্য সেই যে স্ত্রীর রূপার পৈঁছাটি বারো আনায় বাঁধা দিয়াছিল, তাহা আর

ছাড়াইয়া আনিবার সময় হয় নাই। সে কি রামসুখ লোহারের কাছে আজও আছে? সুদে-আসলে সে হযতো বিক্রযই হইয়া গিয়াছে।

আপন মনেই রাগিয়া বলে,—চুলোয় যাক্। তাকে কি আর ঘরে নোব? তাকে কুটি-কুটি ক'রে কাটলে তবে রাগ যায়।

মাঝে-মাঝে তার বিস্ময়ও লাগে। যে লোকটির সঙ্গে তার স্ত্রী পলাযন করিয়াছে, সে যেমন কদাকার, তেমনি কয়লার মতো কালো;—বড় বড় ভাঁটার মতো লাল চোখ, অত্যন্ত পুরু ঠোঁট, চোখ বসিয়া গিযাছে, গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙ্গা। কোনো স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় এমন লোকের শয্যাংশ কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া পায না।

বেন্টো আপন মনেই হাসে; স্ত্রীর উদ্দেশে বলে,—এমন পিরিত্তিও তোর মনে মনে ছিল!

মহিম তখন সোল্লাসে বর্ণনা করিতেছিল, কিভাবে সেই সোনার বোতাম-সেট্‌টা সে সরাইযা ফেলে। বেন্টোকে সে এমন ভরসাও বার বার দিল যে, বাহির হইযা গিযা সে সুদক্ষভাবেই বেন্টোর সাকরেদী করিতে পারিবে।

বেন্টো কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল। মহিমের মতো সাকরেদ পাওয়ায় সে যে উল্লসিত হইয়াছে এমন ভাব দেখা গেল না।

সে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, বেশ ফর্সা মেযে একটা অতি কুচ্ছিৎ লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে?

তার মনে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হইতেছিল, ছেলে যে কথা বলিযা গিয়াছে তাহা হয তো সত্য নয। তার স্ত্রীর না হয বয়স ত্রিশের কাছে, কিন্তু কন্যা তো ষোড়শী এবং তাহাকে সুন্দরীই বলা যায। সে কেন অপর একটি কুৎসিত লোকের সঙ্গে চলিয়া যাইবে?

কিন্তু সোনার বোতাম বাবদ নগদ কিছু হাতে আসিবার সম্ভাবনায় মহিমের মেজাজ দিল-দরিযা হইযা উঠিযাছিল। সে অবলীলাক্রমে বলিল—

—আক্‌সার। শুনবি তাহ'লে?—আমাদের পাড়ায় মতি ড্রাইভার

থাকতো, কোন্ ডাক্তারের বাড়িতে মটর চালাতো। একদিন হঠাৎ এক মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত! তার রূপ দেখে তো অবাক্! মেম সাহেবের মতো রং,—যেন ফেটে পড়ছে। বছর আটাশ-ঊনত্রিশের বেশি বয়স নয়। একেবারে পরী, মাইরি। সে ভাই, তার চলন, বলন, কথার ধরণ--

মহিম আর বলিতে পারিল না। বেল্টোকেই বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

বেল্টো হাসিয়া হাতখানি সরাইয়া দিয়া বলিল,—তারপর?

--তারপরে একদিন সকালে পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও- আর মতি-ড্রাইভারের হাতে ইয়া হাতকড়ি। সেই ডাক্তাবের বৌকে সে ফুসলে এনেছে। আমরা বললাম,—হুঁ, হুঁ, বাব! কিন্তু কোথায় কি?—

মহিম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুই বললে বিশ্বাস করবি নে মাইরি,—কিন্তু মেয়েটা কোথায় ঘরের মধ্যে কি করছিল, একেবারে হুড়মুড় ক'রে পুলিশের মধ্যেখানে এসে এ্যায়সা ইংরিজি বলতে লাগলো যে দারোগা একেবারে থ'—

চটাং করিয়া একটা তালি মারিয়া বলিল,—এক্কেবারে থ'। সুড় সুড় ক'রে মতিকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

বেল্টো চিৎ হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিল। বলিল,—আর মতি?

মহিম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে পাশের একজন কয়েদীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল,—দুঃ শালা।

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া মহিম বলিল,—মতির তখন কাপড়ে-চোপড়ে—। ছাড়া পেয়েও তার কান্না থামে না। তখন ভাই,—তখন ভাই - (মহিম ছ্যাঁচড়াইযা বেল্টোর কাছে সরিয়া আসিল)—মেয়েটা তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সে যে কি আদর করতে লাগলো, তা আর কি বলবো। মেয়েটি কত সাহস দিলে, কিন্তু মতি-ড্রাইভার কি মানে? সে যত কাঁপে, তত কাঁদে।

এইখানে মহিম থামিল। আপন মনেই বলিল,—আর আমি শালা এক শ্যাওড়াতলার পেত্নীকে নিয়ে ছ'বচ্ছর ছিঘরে! বাঁচানো চুলোয় যাক্, ছুঁড়ী দিলে ঠেলে জেলে! একবার বেরুই তো—বলিয়া সেই শ্যাওড়াতলার পেত্নীকে এইখানে বসিয়াই শাসাইয়া রাখিল।

বেষ্টো বলিল,—মতি বেঁচে গেল?

মহিম ঠোঁট উল্টাইয়া জিহ্বা ও তালুসংযোগে এক প্রকাব শব্দ করিযা বলিল,—ওঃ! বাঁচা অমনি সোজা কিনা? তিনটি হাজার টাকা খেসারৎ গুণে নিয়ে তবে ডাক্তার ছাড়লে।

—মতির কি অনেক টাকা?

মহিম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিল,—মতির অষ্টরম্ভা! টাকা দিলে মেয়েটা। কড়কড়ে নোট ফেলে দিয়ে মতির হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে মটরে বসালে। কাছারী ভেঙ্গে লোক ছুটলো তাকে দেখতে। সে গেরাহ্যিও করলে না। ভঁক্ ভঁক্ ক'রে মটর দিলে ছেড়ে।

—হুঁ—বলিয়া বেষ্টো-গাঁটকাটা আপন মনেই কত কি ভাবিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল,—সে মেয়েটা আছে এখনও?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মহিম বলিল,—কে জানে ভাই, আছে না গেছে। ওসব থাকার মেয়ে তো নয়। তবে আমি যখন আসি তখন তো ছিলো।

বেষ্টো বলিল,—হুঁ!

বহুদিন আগে যখন সে জেলের বাহিরে ছিল, তখন টক্‌টকে লাল-শাড়ী-পরা অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে দেখিয়াছিল। আজও তাহাকে ভোলে নাই। সেই মেয়েটিকে এই মেয়েটির আসনে কল্পনা করিয়া সে শুধু ভাবিতেছিল,—অত বড় ডাক্তারের প্রাসাদে যাহার মন ভরিল না, সেই বরাঙ্গনা মতি-ড্রাইভারের কুঁড়েঘরের ছোট অঙ্গনে হাঁপাইয়া ওঠে না?

একটু পরে মহিম বলিল,—কিন্তু এদানি মেয়েটাকে ড্রাইভার বড় দুঃখ দিতো।

দুঃখ দেওয়ার কথায় বেষ্টো অজ্ঞাতসারেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মহিমের দিকে পাশ ফিরিয়া বলিল,—কি রকম? কি রকম?

—টাকা-পয়সাও ছিলো না আর। প্রায়ই খিটিমিটি হোতো। মাঝে-মাঝে মেয়েটাকে মার-ধোরও করতো।

বেষ্টো বিরক্ত হইয়া কহিল, -মাগী চলে যায় না কেন?

এ প্রশ্নের মহিম জবাব দিতে পারিল না। সুন্দরী, শিক্ষিতা ধনী-গৃহিণী পুত্র-কন্যা এবং রূপবান, বিত্তবান, গুণবান স্বামী ছাড়িয়া কেন যে একটা অশিক্ষিত, অমার্জিতরুচি ড্রাইভারের ঘর করিতে আসে এবং সহস্র নির্যাতন কেনই বা মুখ বুঁজিয়া সহ্য করে এ প্রশ্নের জবাব বোধ হয় যে-বিধাতা মানব-মনকে বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু মানব-মনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মহিমের কোনো কৌতূহল ছিল না। প্রভাতের বেশি দেরি নাই। ইহারই মধ্যে বোতাম-সেট্‌টি সামলাইতে হইবে এবং সে কাজে বেষ্টো-গাঁটকাটার সাহায্য নহিলে চলিবে না।

সে বেষ্টোকে একটা খোঁচা দিয়া বলিল,—বোতামটা নে।

বেষ্টো বিরক্ত ভাবে বলিল,—দে।

মহিম একগাল হাসিয়া বলিল,—মাইরি আর কি! টাকা দে। পাঁচ টাকার কমে হবে না কিন্তু। আমার পাঁচ, তোমার পাঁচ, আর—

অন্যদিন হইলে খানিকটা দর কষাকষি না করিয়া বেষ্টো ছাড়িত না। কিন্তু আজ আর দর কষিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে কোথা হইতে পাঁচ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল,—এই নে।

নোটখানি লইয়া মহিম তাহার হাতে বোতামটি গুঁজিয়া দিল। বেষ্টো চক্ষের পলকে সেটি কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

এ কোণে নবী নওয়াজ ও বিশ্বেশ্বরের চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। কি একটা অসহ্য জ্বালায় দুজনেই উস্‌খুস্‌ করিতেছিল।

শেষ প্রহবে প্রহরী বাহিবের বারান্দা দিয়া খট্‌খট্‌ করিযা টহল দিতেছিল। ভোরের তখন বেশি দেরি নাই।

নবী নওয়াজ আস্তে আস্তে ডাকিল,--মাস্টের!

বিশ্বেশ্বব সাডা দিল না, শুধু চোখ মেলিয়া চাহিল।

নবী নওযাজ ভাবি গলায় বলিল, আচ্ছা, আমাব ভাই যে মারা গেল, তার জন্যে আমার চেযে কি হাকিমের শোক হয়েছে বেশি?

বিশ্বেশ্বরের উত্তব দিবার কিছু ছিল না। সে নবী নওয়াজের মুখের দিকে নীরবে চাহিযা বহিল।

নবী নওযাজ আব একটা কি বলিবার চেষ্টা করিল। পারিল না, শুধু দুহাতে মুখ ঢাকিযা ফুলিযা ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুদীর্ঘ কাল পরে ভাইয়ের বিয়োগ-ব্যথা হয়তো নবী নওযাজ ভুলিয়াছে। মানুষের শোক বেশি দিন বাঁচে না। কিন্তু মানুষেব সর্বপ্রকাব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া দিনযাপনের দুঃখ তাহাকে বিঁধিয়া-বিঁধিয়া জজ-সাহেবের পাথরেব মতো শক্ত, ভাবলেশহীন মুখটি স্মবণ কবাইযা দেয। ভাইকে সে ভুলিযাছে, কিন্তু যে তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিযাছে তাহাকে নিয়ত মনে পড়ে।

ঘানি টানিয়া, পাথর ভাঙ্গিযা, দড়ি পাকাইযা শুধু তাহার হাতেই কড়া পড়ে নাই, মনেও কড়া পড়িযাছে। তাহাব পূর্বের ভদ্র মনের আজ অল্পই অবশিষ্ট আছে। চিন্তাধারাবও সামঞ্জস্য নাই। তথাপি দুর্বল মস্তিষ্কে সে অনেক কথা ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কূল-কিনাবা পায না। পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ চমকাইযা থামিযা পড়ে; চিন্তাব খেই হাবাইযা বিহ্বলেব মতো চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিযা চায়। তারপবে আবাব কাজে মন দেয, কিন্তু একটা অস্বস্তি থাকিযা যায,—কি যেন হারাইযা গেছে।

এ জীবনে অনেক কিছুই সে হারাইযাছে। কিন্তু ইহার কোন্‌টির মূল্য সব চেয়ে বেশি তাহা কে বলিবে? বস্তুর কি মূল্য আছে? বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বস্তু অমূল্য হইযা উঠে। নবী নওযাজের কখনও মনে হয, এই সময় যদি তাহাব ছোট মেয়েটিকে একবাব কোলে করিতে পাইত - বিনিময়ে সে সর্বস্ব দিতে পাবিত। কখনও মনে পড়ে স্ত্রীকে, কখনও—

কিন্তু তাহার আবার সর্বস্ব! তাহার আবার বিনিময!

নবী নওয়াজ অনেক কিছুই ভাবিতে চেষ্টা করে. ওই জজ সাহেবটি হযতো আইনের জাহাজ। কিন্তু জজ তো মানুষের বিচার করে না, করে

তাহার অপরাধের। আইনও মানুষের দুর্বলতা ক্ষমা করে না। সবলতর পারিপার্শ্বিক ঘটনার স্রোতে মানুষ কুটার মতো ভাসিয়া চলে,—তাহার কৃতকর্মের দায়িত্ব সকল সময়ে তাহার নিজের নয়। কিন্তু সে হিসাব রাখিতে গেলে বিচারের ব্যবসা চলে না। আইনে খাতায তাই মানুষের চেয়ে তাব অপরাধের হিসাবটাই বড়।

এই কথাই সে ভাবিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এমন করিয়া ভাবিতে পারে না। মধ্যপথে সকল চিন্তা ঘোলাইযা ওঠে। আবার এমনি চিন্তায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাইবারও উপায় নাই। পরের দিনের খাটুনি আছে। সুতরাং নিদ্রা যাওয়া প্রয়োজন।

তখনও খানিকটা রাত্রি আছে। পবেব দিনের খাটুনির কথা ভাবিযা নবী নওয়াজ ঘুমাইবার চেষ্টা কবিল। পরিশ্রান্ত শরীর চিন্তার কুযাশাব মধ্যে ধীরে ধীরে এলাইয়া পড়িল।

কিন্তু সে কতক্ষণই বা! তাহাব ঘুম কেবল জমিয়া আসিযাছে এমন সময ঢং ঢং শব্দে সকালের ঘণ্টা বাজিযা উঠিল। তারপরে আবার সেই অতি পুরাতন দৈনন্দিন কর্ম।—

বিশ্বেশ্বরকে এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ করিতে হয় না। সকলে কাজে যায়, সে সমস্ত সকাল-বিকাল একবাব এ জানালাব গরাদে ধরিয়া, একবাব ও জানালার গরাদে ধরিযা বাহিরেব দিকে চাহিযা থাকে। ক্লান্তি বোধ কবিলে বিছানায় আসিযা শুইযা পড়ে। ঘুম আসে না, আবার উঠিয়া গিযা জানালার গবাদে ধরিয়া দাঁড়ায়।

স্পেশাল ওয়ার্ডেব পাঁচীলের ধারের নেড়া গাছটি দক্ষিণের জানালা খুলিলেই চোখে পড়ে। এক জোড়া চিল কাঠি-মুঠি দিযা তাহার একটা ডালে বাসা বাঁধিয়াছে। একটা ছানাও হইয়াছে,—অতি কদাকার চেহারা, ছোট্ট পালকহীন মাথাটা উঁচু করিয়া মাঝে মাঝে খাবারের জন্য চেঁচায।

তাহার মা'টি দিবারাত্রি তাহাকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকে। দূরের আর একটি ডালে মদ্দা চিলটি নিতান্ত নিস্পৃহভাবে তুরীয় লোকের প্রাণীর মতো ঝিম্‌ হইয়া বসিয়া থাকে। ওই শাবক, তাহার জননী এবং সযত্ন গঠিত নীড়, কিছুরই উপর যেন তাহার আকর্ষণ নাই। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার রান্নাঘরের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে আড় চোখে চায়, এবং সুযোগমত ছোঁ মারিয়া কখনও মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি, কখনও বা অন্য কিছু আনিয়া বাসার কাছে ফেলিয়া দিয়া আবার তেমনি নিস্পৃহভাবে দূরের ডালটিতে গিয়া বসে।

গোটাকয়েক কাক কিছুদিন হইতে বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদেরও বাসা বাঁধিবার সময় আসিতেছে। কিন্তু কাঠি মুঠি সংগ্রহ করিবার কষ্ট তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। চিলের বাসাটি ভাঙ্গিয়া তাহারই কাঠি-মুঠি দিয়া বাসা বাঁধিতে চায়। সেদিন মাদী চিলটি কোথায় গিয়াছিল। মদ্দাটি যে দূরে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া আছে কাকটি বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে নিঃশঙ্কচিত্তে চিলের বাসা হইতে কাঠি-মুঠি সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। ছানাটি প্রাণভয়ে চেঁচাইতেই চিলটি সোঁ করিয়া আসিয়া এমন ভাবে কাকটিকে ঝাপ্‌টা মারিল যে কাকটি প্রথমে মাটিতে হুমড়ি খাইয়া পড়িল এবং সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে একদিকে পলায়ন করিল।

তৎপরে আরম্ভ হইল যুদ্ধ: —

মাদী চিলটি আসিয়া ছানার কাছে বসিল। অপর পক্ষে গোটা বিশেক কাক গাছটিকে বেড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া কা কা করিতে লাগিল, এবং সুযোগ পাইলেই চিলটির মাথায় ঠোকর দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাক লঘুপক্ষ, যখন-তখন যে কোনো দিকে বেঁকিতে পারে। চিলটি একবার ঝপ্‌ ঝপ্‌ করিতে করিতে তাড়া করে, আবার নিজের ডালটিতে ফিরিয়া আসিয়া বসে।

এমনি চলিল মিনিট পনেরো। তারপরে কাকগুলিও ক্লান্ত হইয়া নিজের নিজের স্থানে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর দক্ষিণের জানালাটি খুলিয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। ওই শাবকটির কল্যাণে দুটি চিলে আজ বাসা বাঁধিয়াছে। একটিতো সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ছানাটির পাশে বসিয়া থাকে। যেদিন অঝোরে বৃষ্টি ঝরে সেদিন দুটি পক্ষ মেলিয়া দিয়া ছানাটিকে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করে। আহার নিদ্রা একরকম বন্ধই করিয়াছে। আর একটি যেখানে যাহা পায় ঠোঁটে করিয়া আনিয়া বাসায় ফেলিয়া দেয়, শিশুটির মা ঠোঁটে করিয়া ছিঁড়িয়া খাওয়াইয়া দেয়। বাসাটিকে মদ্দা চিলটি সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে।

আদালতে হলফ্ পড়িয়া কিম্বা দেবতা সাক্ষ্য করিয়া ইহাদের বিবাহ হয় নাই। বাচ্ছাটিকে খাওয়ানোর জন্য বাধ্য করিবার কোনো আইনও নাই। তবু সন্তানটিকে বাঁচাইয়া বড় করিয়া তুলিবার কোনো ত্রুটিই কোনো পক্ষের নাই। আগামী বারে এই ছানাটিই যখন বড় হইবে তখন তাহাকে তাহার বাপ-মা কেহই চিনিতেও পারিবে না। ছানাটিকে বড় করিবার দায়িত্ব শেষ হইয়া গেলেই ইহাদের কে যে কোথায় যাইবে তাহারও কোনো স্থিরতা নাই। আগামী বারে আবার নূতন মিথুন নূতন ডালে বাসা বাঁধিবে, আবার একটি নূতন প্রাণীকে বাঁচাইয়া তোলার দায়িত্বপালনে।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই হাসিল।

এমন সময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে নবী নওয়াজ আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিশ্বেশ্বরকে একরকম টানিয়া এক কোণে লইয়া গিয়া মুখে-চোখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—ভালো খবর আছে মাস্টের।

তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া 'মাস্টের' অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। নবী নওয়াজের সমস্ত মুখ অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল,—খবর খুব ভালো, মাস্টার। বোধ হয় আজকেই, না হয় কাল নিশ্চয়ই আপনাকে সাহেবদের ওয়ার্ডে পাঠাবে। আফিস থেকে নিট্ খবর নিয়ে আসছি।

'সাহেবদের ওয়ার্ড' সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বরের কোনো জ্ঞানই ছিল না। সুতরাং কোনো উল্লাসের চিহ্নই তাহার মুখে দেখা গেল না।

নবী নওয়াজ তাহাব একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাতে একটু চাপ দিতে দিতে বলিল,- বেশ থাকবেন ওখানে। খাওয়া, শোওয়া, থাকা, সব দিকেই তোফা আরাম,—কোনো তক্লিফ নাই। দিব্যি থাকবেন। আলাদা ঘব,—চেযাব দেবে, টেবিল দেবে, একেবারে কংগ্রেসের বাবুদের মতো।

বলিযা বিশ্বেশ্ববেব পানে চাহিয়া কি যেন উত্তর প্রত্যাশা কবিযা একটু বিষাদের হাসি হাসিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর কোন উত্তরই দিল না। ঠিক ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত সে উপলব্ধি কবিতে পারে নাই।

নবী নওয়াজ আবার বলিল,—এখানে অনেক কষ্টই হ'ল আপনাব,- খানা-পিনা সব বিষযেই। তাবপবে ভদ্দব লোকেব ছেলে আপনি, এই শালা চোবদের সঙ্গে কি থাকতে পাবেন?

বিশ্বেশ্বর এবারও কোনো উত্তব দিল না।

নবী নওযাজ বলিল,- তবু আপনাকে পেযে দু'দিন বেশ কাটলো। দুটো মনের কথা কইবার লোক পেয়েছিলাম।

সে হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আচ্ছা, আমাকে ওখানে কেন পাঠাচ্ছে জানো?

—বলেন কি মাস্টের? আপনার তরফ থেকে দরখাস্ পড়েছিল যে। ঘবোয়ানা ঘরের ছেলে, পেটে এলেম আছে, এই চোথা জায়গায় থাকবেন কেন?

--আচ্ছা, 'সাহেবদের ওযার্ডে' যাবা থাকে তাবা সব লোক ভালো?

নবী নওয়াজ হাসিযা ফেলিল। বলিল,—ভালো লোক কি জেলে আসে মাস্টের? ওরাও কেউ খুনে, কেউ চোর। বাঙালীও আছে, তবে সাহেবই বেশি। তাই খাতির পায় বেশি।

কথাটা বিশ্বেশ্বব প্রথম শুনিল। একই অপরাধে অপরাধী,—কেউ কালা,

কেউ ধলা; কেউ ধনী, কেউ গরীব। সুতরাং ব্যবহারের বৈষম্য। কথাটা সে ঠিক মন দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল,—

—আমিও খুনে, তুমিও খুনে। অথচ, তুমি থাকবে খারাপ জায়গায়, আর আমি থাকবো ভালো জায়গায়—শুধু আমার তদ্বির করবার লোক আছে ব'লে?

—বিল্‌কুল্‌ তদ্বিরে হয় মাস্টের,—তদ্বিরে হয়। আমিও 'সাহেব ওয়ার্ডে'-এই থাকতাম। কিন্তু তদ্বিরও তেমন হয়নি, আর আপনার মতন ইংরিজিও জানিনে।

বিশ্বেশ্বর শুধু বলিল,—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য্য নয় মাস্টের, আশ্চর্য্য কিছুই নয়। জেলের কানুন শুনলে অবাক হবেন। তবে বলি, শুনুন,—

—আচ্ছা নবী নওয়াজ, আমি যদি 'সাহেব ওয়ার্ডে' না যাই, আমি যদি বলি এইখানেই থাকবো?

নবী নওয়াজ শশব্যস্তে বলিল,—অমন কাজটি করবেন না মাস্টের। এই নরকে মানুষ থাকে? দু'দিন খাটিয়ে আর আস্ত রাখবে না।

বিনা পরিশ্রমে বিশ্বেশ্বরের দিন আর কাটিতে চাহে না, রাত্রে ঘুম হয় না। খাটুনির কথায় সে তাড়াতাড়ি বলিল,

—এরা আমাকে কাজ দেয় না কেন, নবী নওয়াজ? চুপ করে যে দিন কাটে না।

বিশ্বেশ্বরের আগ্রহ দেখিয়া নবী নওয়াজ না হাসিয়া পারিল না। বলিল,—

—কি কাজ পারেন আপনি? ঘানি টানতে পারেন?—ছোবড়ার দড়ি পাকাতে, ঘাস ছিলতে, মাটি কোপা'তে পারেন? পাথর ভাঙতে?

নবী নওয়াজ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

কাজের ফর্দ শুনিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখ শুকাইল। বলিল,—আর কোন কাজ নেই?

—আর কি কাজ দেবে, শুনি! ছেলে পড়ানোর পাঠ তো এখানে নেই। এখানে থাকলে এই কাজ। তবে 'সাহেব ওয়ার্ডে' গেলে প্রেসে কাজ মিলবে খাটুনি কম। দিব্যি থাকবেন। আর যদি হাঁসপাতালে দেয়, তা হ'লে তো—

নবী নওয়াজ দুইটি আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া কেল্লা ফতের ইঙ্গিত করিল।

গলা খাটো করিয়া বলিল,—ফল, দুধ, ডিম,—খান না কেন লুকিয়ে-চুরিয়ে। দু'দিনে শরীর সেরে যাবে। বান্দাকেও তখন যেন মনে রাখবেন।

বলিয়া নবী নওয়াজ কৌতুকভরে দু'টি হাত জোড় করিল।

ঠিক সেই সময় সমস্ত কয়েদী হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে কেহ বাজাইতে আরম্ভ করিল থালা, কেহ মগ্, কেহ বা বাঁ হাত কানে লাগাইয়া এবং ডান হাত আকাশে তুলিয়া খাম্বাজ আলাপ সুরু করিল। আর তারই তালে-তালে জন কতক ছোঁড়া একটা হাত কাঁকালে আর একটা হাত মাথায় দিয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল।

সে এক বিপর্যয় কাণ্ড!

বিশ্বেশ্বর ও নবী নওয়াজ তখন ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া এক কোণে দেওয়ালে পিঠ লাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,- এদের খাটুনি কি অল্প?

নবী নওয়াজ শুধু বলিল,—ওরে বাপ্!

কানাই ছোক্‌রা ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে,—একেবারে বুকের হাড় গোণা যায় এমন রোগা। অত্যন্ত ঢিমা তালে ভিড়ের বাহিরে-বাহিরে সে যখন নাচে তখন মনে হয় একটি কলের পুতুলকে অনন্ত কালের জন্য দম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—এ নাচ আর থামিবে না, এমনি ঢিমা তালে ভিড় বাঁচাইয়া অনন্ত কাল চলিবে।

কানাই একবার নাচিতে-নাচিতে ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—এ ছোক্‌রা কি ক'রে খাটে?

নাচিবার জন্য নবী নওয়াজের মনটাও উস্‌খুস্ করিতেছিল। কিন্তু

বিশ্বেশ্বরের আগমনের পর দিন হইতে কেন যেন ইহাদের সঙ্গে মিশিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল।

সে পরমোৎসাহে নৃত্য দেখিতে দেখিতে বলিল,--অভ্যেস হ'যে গেছে।

হাসি, গান, নৃত্য ও বাদ্যে ঘরের মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া গেল। এ যেন আর বন্ধ হইবে না।

এমন সময় বাহিরে কয়েক জোড়া বুটের শব্দ পাওয়া গেল।

ব্যস্!—

চক্ষের পলকে সমস্ত গীত-বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। যে যার নিজের পুঁটুলি লইয়া নিজের-নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। ইহারাই যে এতক্ষণ মাতামাতি করিতেছিল কাহারও মুখে তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। কেবল কানাই সকলের পিছনে বসিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁপাইতে লাগিল। এত দাপাদাপি তাহার রোগা শরীরে সয় না।

তখনি জেলার সাহেব, জমাদার ও একদল সিপাহী সঙ্গে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত কয়েদী সসম্ভ্রমে সারিবন্দী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

জেলার সাহেব লোক খারাপ নয়। বাড়িতে উগ্রমূর্তি মেম সাহেব, সেখানে কথাটি কহিবার উপায় নাই,—প্রায়ই বাহিরে-বাহিরে ঘোরে। খাবার সময় ভিজে বেড়ালটির মতো বাড়ি যায়,—বাহিরে কয়েদীদের মধ্যে আসিলেই মেজাজ রুক্ষ হইয়া ওঠে। তাহার দাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়।

জেলার আসিয়াই কাহাকেও বুটের গুঁতা দিয়া, কাহাকেও বেতের ছড়ি দিয়া খোঁচাইয়া পুঁটুলি খুলিতে আদেশ করিল।

সোনার বোতাম চুরি লইয়াই এই কাণ্ড।

এবং কি করিয়া কি হইল ভগবান জানেন, বোতাম বাহির হইল বিশ্বেশ্বরের খোলা বিছানার মধ্য হইতে।

বিশ্বেশ্বর তখনও ব্যাপারটি ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। সাহেব বেত উ'চাইয়া একেবারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ক্যায়সে চোরি কিয়া?

বিশ্বেশ্বব অবাক্!

সে শুধু নিষ্কম্প স্বরে বলিল,—I didn't.

সাহেব উ'চানো বেত নামাইয়া লইল। ইংবাজিতে বলিল.—তবে তোমার কাছে এলো কি ক'রে?

জানি না।

সাহেব অনেকক্ষণ তীব্র স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরও সোজা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—এতটুকু কাঁপিল না, একবারও চোখ নামাইল না।

বিশ্বেশ্বরের পাশেই নবী নওয়াজ দাঁড়াইয়া ছিল। সাহেবের চোখ গিয়া তাহার উপর পড়িল।

—তুম্ চোবি কিয়া, শালা।

নবী নওয়াজ দু'টি হাত জোড় করিয়া বলিল,—নেহি হুজুর।

সপাৎ করিয়া তাহার পিঠে বেত পড়িল।

সাহেব গর্জন করিল,—আল্‌বৎ কিয়া।

নবী নওয়াজ আর্তস্বরে বলিল,—নেহি হুজুর।

সাহেবের তখন রোখ চাপিযা গিয়াছে।

—তব্ কোন্ লিয়া?—বোলো—বোলো—বোলো—জল্‌দি বোলো--

সাহেব নবী নওয়াজের মুখের উপর অবিশ্রান্ত বেত বর্ষণ করিতে লাগিল।

বেতের পর বেত খাইয়া নবী নওয়াজ তখন আর চে'চায় না। খানিকক্ষণ নীরবে বেত খাওয়ার পর সে শুধু বিশ্বেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—ওহি লিয়া হুজুর।

সাহেবের বেত থামিল।

—তুম্ জান্তে হো?

—হাঁ, হুজুর।

সাহেব ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল,- liar.

নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া অসহায় কয়েদীর ভীরুতা লইয়া কৌতুক করিতে সাহেবের ভালো লাগে।

সে দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গীতে কোমরে দুই হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজিতে বলিল,—

—তোমার নাম বিশ্বেশ্বর?

—হ্যাঁ মহাশয়।

—তোমাকে নির্জন সেলে বন্ধ রাখার হুকুম এসেছে।

জেলের নিয়ম বিশ্বেশ্বর জানে না; চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব গর্জন করিয়া বলিল,—Say, thank you.

বিশ্বেশ্বর রাগে গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কতদূর পড়েছ তুমি?

—এম-এ।

সাহেব চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—Oh my!—কি করেছিলে তুমি? বোমা?

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—না, খুন।

সাহেবের চোখ আরও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এম, এ, পাশ করিয়া মানুষ বোমা তৈরি করে, ইহাই জেলার জানে। তাহারা যে খুনের অপরাধেও জেল খাটিতে আসে এ ধারণা জেলারের ছিল না।

বলিল,—কি রকম?

বিশ্বেশ্বর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—স্ত্রীকে খুন করেছিলাম।

সাহেবের নিজের স্ত্রী ছয় ফুট লম্বা। নিজেই কখন খুন হয় এই ভয়ে সাহেবকে পলাইয়া বেড়াইতে হয়। স্ত্রীকে খুন করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বিশ্বেশ্বরের উপর শ্রদ্ধা জন্মিল।

আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল,—Splendid।

কিন্তু কয়েদীদের সম্মুখে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া জেলার লজ্জিত হইয়া তখনই কঠিন হইয়া বলিল,—তোমাকে টিকটিকিতে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম হয়েছে।

টিকটিকির কথায় বিশ্বেশ্বর ভয় পাইয়া গেল। বলিল,- কেন?

-কৈফিয়ৎ চাও?

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া গেল।

সাহেবের গাম্ভীর্যের আবরণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। সে বিশ্বেশ্বরকে সরাইবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

জেলার চলিয়া যাইতেই কয়েদীদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্মচারি যত নিম্নপদস্থ হয়, তাহার তেজ তত বেশি। জমাদারের হুংকারে গুঞ্জন থামিয়া গেল।

জমাদার বিশ্বেশ্বরকে হুকুম দিল,—উঠাও তল্পী।

একটু আগে নবী নওয়াজ খবর দিয়াছিল, বিশ্বেশ্বরকে 'সাহেব ওয়ার্ডে'-এ পাঠানো হইবে। এখন হুকুম হইল টিকটিকির। টিকটিকির সহিত বিশ্বেশ্বরের কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, উহা ইংরাজি T এর মতো একটা যন্ত্র, যেখানে উলঙ্গ করিয়া বাঁধিয়া কয়েদীদের প্রহার করা হয়। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া উঠিল। তল্পী বাঁধিতে গিয়া বাঁধিতে পারে না।

টিকটিকির স্বরূপ জানে নবী নওয়াজ। ইতিপূর্বে নিজে একবার সে-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। সে আর থাকিতে পারিল না। জমাদারের পা জড়াইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। লজ্জায় হাত দিয়া চোখ মুছিতে পারিল না। জমাদারের দিকে মুখ আড়াল করিয়া পুঁটলি হাতে লইয়া বলিল,— চলো জমাদার সাহেব।

নবী নওয়াজ কান্নাও থামায় না, পাও ছাড়ে না। কাতরকণ্ঠে কেবলই বলে,—ওর কোনো দোষ নেই জমাদার সাহেব। ও চুরি করে নি।

অথচ এই নবী নওয়াজই বিশ্বেশ্বরকে চোর বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল।

জমাদারের ইয়া গোঁফ, তার সঙ্গে গালপাট্টা। রসিকতার ধার ধারে না। সে নবী নওয়াজকে বেতের খোঁচা দিয়া বলিল,—আরে, কেয়া জেনানাকা মাফিক বোতে হো, উল্লু; ইস্‌কো 'সাহেব ওয়ার্ড' মে লে যাতা হায়। উস্‌মে রোণেকো কেয়া হ্যায়?

তবে সবই জেলারের রসিকতা?

নবী নওয়াজ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। ছাতা-পড়া দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল,—দেখলেন মাস্টের, আমি বলেছিলাম হুকুম এসেছে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের তখন কথা কহিবার অবস্থা নয়। সে জমাদারের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

নবী নওয়াজ অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও দমে নাই। সে নিঃসংকোচে বিশ্বেশ্বরের একটা হাত ধরিয়া চুপি চুপি বলিল,—আমি সব ওয়ার্ডে যাই মাস্টের। আবার বিকেলে দেখা হবে।

বিশ্বেশ্বর শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—আচ্ছা।

বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেল। নবী নওয়াজ এক দৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। যখন পিছন ফিরিল, তখন বোগা কানাই কোমর ঘুরাইয়া গান ধরিয়াছে,—

আমার প্রাণের রাধা কম্‌নে গেল
গেল না বলে
আমি যমুনাতে প্রাণ সঁপিব
হায়! হায়!—

বাকী লাইন কানায়ের মনে পড়িল না, সে শুধু শুধুই কোমর ঘুরাইতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ডজন থালা-বাসনও বাজিয়া উঠিল।

নবী নওয়াজ অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—চোপ্‌ শালারা। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কোমর ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল,—

হায়, হায়, গেল না বলে,—

ভয় বলিয়া কোনো পদার্থ বিশ্বেশ্বরের মনে ছিল না।

তাহাদের গ্রাম হইতে দূরে বিলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বড় বটগাছ অজস্র ছায়া ও প্রচুর রহস্য বিস্তার করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের তিন মাইলের মধ্যে কোথাও গ্রাম নাই। লোকে বলিত, "সিধুর মায়ের বটগাছ"। কোন্ কালে কোন্ সিধুর জননী এই বটবৃক্ষটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সুদূর প্রান্তরে এই ছায়াবান বটবৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে রহস্য লোকের মুখে মুখে ফেরে তাহাতে দিবা দ্বিপ্রহরেও কেহ তাহার কাছ দিয়া যাইতে সাহস করে না। গাছের ডালে ডালে বিবিধ প্রকারের স্ত্রী ও পুরুষ ভূত তো আছেই, গাছের নীচেও অগণিত হতভাগ্যের ছিন্ন শির দিবারাত্র গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করে, আর ঠকাঠক্ পরস্পরকে আঘাত করে। এ শব্দ অনেকেই শুনিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর তখন খুবই ছোট। একখানি বৃহৎ পঞ্জিকা, খান দুই কবিরাজের দোকানের গীতিবহুল বিজ্ঞাপন-পুস্তক এবং আরও কয়েকখানি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে দপ্তর মোটা করিয়া খুব ভারিক্কি চালে পাঠশালে যায়। দীঘির শান-বাধানো ঘাটে বসিয়া কাঠ-কয়লা দিয়া শ্লেট মাজিতে মাজিতে বিশ্বেশ্বর দূরের "সিধুর মায়ের বটগাছটি"র পানে চাহিত, আর সমস্ত মন ওই গাছটির সান্নিধ্যলাভের জন্য লোভার্ত হইয়া উঠিত।

ছেলেবেলার কথা এখনও তাহার জ্বলজ্বল করিযা মনে পড়ে। কতবার সেই বটগাছটির কাছে যাইবার জন্য তাহার সঙ্গীদের সে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে কেহই সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই। সমস্ত দিন ওই গাছটির হিম-শীতল ছায়াতলে ভূতের শিশুরা

কপাটি খেলে, কচি কচি খোকাখুকীরা মাতৃ-স্তনদুগ্ধের পিপাসায় 'ওঁয়া ওঁয়া' করিয়া চেঁচায় এবং ভূতের অন্তঃপুরিকারা গাছের ডালে ডালে আঁচল উড়াইয়া দোল খায়। ওখানে যাইবার সাহস তাহার বয়সের ছেলেদের কাহারও ছিল না। কত দিন তৃষিত নেত্রে বিশ্বেশ্বর ওই গাছটির পানে চাহিয়াই থাকিত।

তারপরে—তাহার জীবনের সে একটি স্মরণীয় দিন—একদিন গ্রীষ্ম-কালে ভর দুপুর বেলায়, আর সব ছেলেরা যখন মায়ের কোলে সুখসুপ্ত ছিল, সকলের চোখ এড়াইয়া বিশ্বেশ্বর বিলেব পথে ছুটিতে লাগিল। প্রখর রৌদ্র, সর্বাঙ্গে তাহার ঘাম ঝরিতেছিল, সমস্ত পথে ছায়ার চিহ্নমাত্র নাই, পথের দু'পাশে ফুটি ও কাঁকুড়, খরমুজ ও তরমুজের লতা নিঃশব্দে শুইয়া আছে, উঁচু-নীচু মাঠ চৈতালী ফসলে শ্যামল। সে গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই ছুটিয়া চলিল। কত পথ ছুটিয়া শেষকালে—আঃ!

গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় তাহার শরীর জুড়াইয়া গেল। বিপুলকায় গাছের চারিদিকে বিস্তর ঝুরি নামিয়াছে। ডালে ডালে কত পাখী দিবারাত্র কিচির-মিচির করিয়া সেই নিস্তব্ধতাকে মধুর করিযা তুলিতেছিল। দূরে চারিদিকে গ্রাম-সীমান্তের বনরেখা বৈশাখের দ্বিপ্রহরে কেমন যেন ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল। কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। ভয়? ভয় একটু করে বই কি! কিন্তু তারও চেয়ে বেশী আসে ঘুম। এমনি তপ্ত দিনে এমন ঘন ছায়ায় চোখ দুইটি যেন আপনা হইতেই বুজিয়া আসে।

তাহার বন্ধুবা কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাসই করে নাই। প্রাচীনের দল ওই গাছটির সম্বন্ধে কত গল্প আজও করে। তাঁহারা নিজে কেহ কিছু দেখেন নাই বটে, কিন্তু এ তো মিথ্যা নয় যে, গোটা পাঁচ সাত নিশাচব ভূত সমস্ত দিন উহার বিভিন্ন ডালে পা আট্‌কাইয়া নিম্ন মুখে বাদুড়ের মতো বিশ্রাম করে এবং রাত্রে সারারাত গাছময় দাপাদাপি করে। একদল আলেযা যে উহার চারিদিকে গেণ্ডুয়া খেলিয়া বেড়ায় এ তো সকলেই দেখিয়াছে। তেমন জায়গা হইতে কেহ কি প্রাণ লইযা নিরাপদে ফিরিতে পারে? বিশেষতঃ, শিশুমাংস.. হুঁ!

বিশ্বাস করিয়াছিলেন শুধু বিশ্বেশ্বরের বিধবা মা। তাহার আজও মনে পড়ে দুরন্ত শিশুকে কোলে লইয়া সমস্ত রাত তিনি কী কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন! কত দেবতারই না আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন!

এই স্নেহপরায়ণ মা'টিকে সে কোনদিন স্বস্তি দেয় নাই। দুরন্ত ছেলে কখন কি করিয়া বসে সেই ভাবনায় তাঁহার ঘুম ছিল না। বারো বছর বয়সের মধ্যে গাছের মগডাল হইতে চার বার সে পড়িয়া যায়, বাঁ হাতের কনুয়ের কাছটা এখনও বেঁকিয়া আছে। একবার শীতকালে বাজি রাখিয়া দীঘি পার হইতে গিয়া শীতে জমিয়া সে ডুবিয়া গিয়াছিল, বহু কষ্টে উদ্ধার করা হয়।

আর একবার—

তাহাদের গ্রাম হইতে মাইল ছয়েক দূরে মেলা বসে। গঙ্গাতীরে মস্ত বড় মেলা, স্নানার্থীনী পুণ্যলোভাতুরা বিধবাদের বিপুল সমাবেশ হয়। মাঘমাসে মেলা,—সুতরাং চাষের কাজ শেষ করিয়া বহু কৃষক দলে দলে মেলায় গিয়া আমোদ করে। আমোদের মধ্যে তিনরাত্রি কলিকাতার যাত্রা, আর জুয়া খেলা। একটা দিকে একদল সন্ন্যাসী গায়ে ছাই মাখিয়া কেহ সূক্ষ্মাগ্র লোহার উপর শুইয়া, কেহ ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া, আর কেহ বা শুধু-শুধুই চিম্‌টি বাজাইয়া লোক জড় করে। গাঁজার ধোঁয়ায় ওদিকটা দিনরাত্রি অন্ধকার হইয়া থাকে। কাছেই আবগারী দোকান, সেদিকে ভিড় ঠেলা যায় না। কত ছোট ছেলেও যে বিবিধ নেশায় পরিপক্কতা লাভ করিতেছে এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিলেই বোঝা যায়। মেলার সংলগ্ন পশ্চিমপ্রান্তে দরমা দিয়া তিন সারি ছোট ছোট খুপ্‌রি তৈরি করা হইয়াছে। বিগতযৌবনা, রোগবিবর্ণ, কদাকার একদল হতভাগিনী দিন দুই টাকা ভাড়া দিয়া উহারই এক একখানি করিয়া খুপ্‌রি ভাড়া লইয়াছে। মাঝে-মাঝে বাহিরে আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে হিল্‌হিল্‌ করিয়া কাঁপে। কিন্তু ভালো করিয়া রৌদ্র পোহাইবারও সময় নাই। প্রতি সন্ধ্যায় সেদিনের ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিতে হইবে।

এমনি মেলা। সকাল হইতে রাত্রি দুটা পর্যন্ত বহু কণ্ঠের কলরবে ও বালকদের বাঁশীর শব্দে মুখরিত এবং ধোঁয়ায় ধুলায় ধূসর। বহুদূর হইতে তাহার শব্দ পাওয়া যায়। মনে হয়, বিরাটরাজের গো-গৃহে বোধ হয় আগুন লাগিয়াছে।

সেই মেলায় একবার সে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স তেরোর বেশি নয়। তাহাদের দলের সকলেই গিয়াছিল। সমস্ত দিন মেলার পথে-পথে ঘুরিয়া অজস্র ধুলো খাইয়া সূর্যাস্তের কিছু আগে সে স্থির করিল, কলিকাতার যাত্রার দলের গান শুনিয়া পরের দিন সকালে বাড়ি যাইবে। এমন সময় তাহাদের গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে দেখা। সে বলিল,—তুমি এখনও বাড়ি যাও নি? তোমার মা দেখগে কেঁদে-কেটে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছেন।

আর বিশ্বেশ্বরের যাত্রা শোনা হইল না। সকলের অনুরোধ ঠেলিয়া সে যখন মেলা হইতে বাহির হইল তখন সূর্য অস্ত গেল। তাহাকে ছয় মাইল পথ চলিতে হইবে, মাঝে একটা পারও আছে। সমস্ত পথ তাহার কেবলই মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখ মনে পড়িতে লাগিল। একমনে সে কেবলি পথ চলে। শীতের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাঠে শোভা আর ধরে না। পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ শব্দ উঠিল, ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া,—অবিকল কচি ছেলের কান্না।

বিশ্বেশ্বরের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল,- সামনেই নুড়িমাধবতলা। যখন এদিকে রেলপথ হয় নাই, উদরান্নের জন্য যখন লোককে বিদেশ যাইতে হইত না, তখন এই নুড়িমাধবতলা দিয়া ভর দুপুরে কিংবা রাত্রে যাহারা গিয়াছে তাহারা আর ফিরিয়া আসে নাই। বিশ্বেশ্বর দু'পা চলে, মনে হয় পিছনে কে যেন আসিতেছে, আবার পিছনে চাহিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়। এমন সময়ে একটা পাখী কচি ছেলের কান্নার মতো ডাকিতে ডাকিতে শোঁ শোঁ করিয়া উড়িয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িল, শকুন-শিশু অমনি করিয়া ডাকে। মনে করিল বটে কিন্তু ভয় গেল না। জোরে-জোরেই পথ চলে। যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন রাত্রি দশটার বেশি নয়।

একলা আসার কথা সে বাড়িতে বলিতে সাহস করে নাই। বলিয়াছিল, অনেক লোকের সঙ্গে আসিয়াছে।

এমনই করিয়া তাহার শৈশব কাটিয়াছে, কৈশোরও কাটিয়াছে। তারপর অনেকগুলি পরীক্ষা পাস করিতে করিতে মনে যেদিন রোমান্সের রং লাগিল, সেদিন আসিল অমলা।

অমলা ধনী জমিদারের আদরের কন্যা। সেকেণ্ড বুক শেষ করিবার পূর্বেই বটতলার যাবতীয় উপন্যাস তার পড়া হইয়া গিয়াছে। মনোমুকুলে অকালেই স্বপন-সুষমা জাগিয়াছে। শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাহার মুখে হাসি আর ধরে না। অত বাদ্য, অত আলো, অত লোকের সমারোহে তার সমস্ত মন ময়ূরের মতো নাচিয়া উঠিল। শাশুড়ী, ননদ, দেবর আত্মীয় পরিজন সকলকে সে তাহার অন্তরের আনন্দপারাবারে ডুবাইয়া দিতে চায়। এবং আর একজনকে—

কিন্তু সে যেন ভরানদীর মতো স্থির : ঠোঁটে তৃতীয়ার চাঁদের মতো হাসি, ক্ষীণ, অথচ অন্তরের শান্তিতে পরিপূর্ণ। তাহার পরিণত শিক্ষিত মন মধুর রসভারে আনত। সে মূর্তি অমলার অপরূপ মনে হয়। বিশ্বেশ্বরের বুকের কাছে বসিয়া অমলা যেন ঝরণার মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু সে চঞ্চলতা বিশ্বেশ্বরকে স্পর্শই করে না। সে হয়তো একটু ক্ষীণ হাসিল, হয়তো ললাটের চূর্ণ কেশগুচ্ছ আলগোছে একটু সরাইয়া দিল, নয়তো অমলার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যেন এমন করিয়া সে অনন্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে।

অমলার লাগে বেশ। কিন্তু একভাবে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা তার ধাতে সয় না। সে মাথা টানিয়া লইয়া অকারণে রাগ করিয়া দূরে সরিয়া বসে। বিশ্বেশ্বর মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসে,—মানও ভাঙ্গায় না, কাছে টানিয়াও নেয় না। অমলার মান করা পোষায় না। পিঠের উপর আঁচল ফেলিয়া

উঠিয়া দাঁড়ায়, গহনা বাজাইয়া, হেলিয়া-দুলিয়া আবার আসিয়া বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সোহাগভরে বলে—ছাড়ো। আমি যাই বেহায়া, তাই তোমার কাছে আসি।

বিশ্বেশ্বর হাসে। বলে, নইলে আসতে না?

'না' বলিতে বাধে। অমলা উত্তর দেয় না, দয়িতের মুখের পানে মুখটি আগাইয়া দেয়।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর কি কিছু বোঝে না? সে শুধু অমলার গাল দুটি টিপিয়া দেয়। তারপর দুজনে নিঃশব্দে শুইয়া থাকিতে থাকিতে কখন এক সময় বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়ে। অমলা অনেক রাত্রি জাগিয়া তাহার পড়া নভেলের প্রেমের দৃশ্যগুলি মনে করিবার চেষ্টা করে।

কিছুই মেলে না।

অমলার সকল পড়াই বৃথা হইয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে বিশ্বেশ্বর আদর করিয়া বলিয়াছিল,—এতদিনে তোমায় কাছে পেলাম। সে কথার মানে সেদিন সে বোঝে নাই। তবু বেশ লাগিয়াছিল। তাহার মুখের আরও কথা শুনিবার জন্য সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমায় নাই। কিন্তু বিশ্বেশ্বর আর কোনো কথা কহে নাই। বিয়ে-বাড়ির কাজ-কর্মের পরিশ্রমের পর ঘুমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অমলাকে ঘুমাইতে বলিয়া সে নিজেও ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘুমটি বিশ্বেশ্বরের সাধা। দুপুরে এক দফা আছে। অমলার ইচ্ছা করিত ফাঁকি দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গাইলে বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত রাগ করে। দুই একবার সে চেষ্টা করিতে গিয়া অনেক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। রাত্রেও তাই। অমলা বন-কপোতীর মতো অনর্গল বকিয়া যায়। হঠাৎ এক সময় দেখে বিশ্বেশ্বর দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তখনও বারোটা বাজে নাই। জাগাইয়াও দেখিয়াছে, আর আলাপ জমিতে চাহে না।

অমলার বন্ধুদের সকলেরই চিঠি আসে একদিন অন্তর, আর কত লম্বা চিঠি! শুধু বিশ্বেশ্বরই চিঠি লেখে মাসে দু'খানা—তাও সাত আট লাইন, যেন কোনো রকমে দায়-সারা। বিবাহের গোড়ার দিকে অমলা একখানা চিঠি লিখিয়াছিল,—মস্তবড় চিঠি। তাতে চাঁদ ও চকোরের উপমা ছিল, জলধর ও চাতকপক্ষীর কথা ছিল, এবং আবও অনেক ভালো-ভালো কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর সে-চিঠির এমন ঠাট্টা করিয়া উত্তর দেয় যে, অমলা সেই হইতে দিব্য করিয়াছিল আর কখনও দীর্ঘ প্রেমলিপি লিখিবে না। লেখেও নাই।

একদিন বিকাল বেলা কি একটা প্রয়োজনে বিশ্বেশ্বর উপরে গিযা দেখে অমলা প্রকাণ্ড বড় কি এক বাণ্ডিল কাগজ দেখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল,— কার চিঠি?

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে অমলার মন বোধ হয় মধুব রসে আপ্লুত হইয়া উঠিযাছিল। সে হাসিযা জবাব দিল,—তোমাব নয়।

—তা জানি। অত বড় চিঠি লেখা আমার কর্ম নয। কিন্তু কার চিঠি?

অমলা চিঠিখানি আগাইযা দিল। এখানে-ওখানে খানিকটা কবিয়া পড়িয়া বিশ্বেশ্বর বুঝিল, তাহার স্ত্রীর কোনো বন্ধুকে তাহার স্বামী চিঠি দিয়া জানাইয়াছে, ধ্যান বলিতে জ্ঞান বলিতে তাহাব কেহ নাই, এমন কি "ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে"।

বিশ্বেশ্বর মৃদু হাসিয়া চিঠিখানি ফেরত দিযা বলিল, এ চিঠি তুমি কি ক'রে পেলে?

—পাঠিযে দিয়েছে। বেশ লিখেছে, না?

বিশ্বেশ্বর জবাব দিল না। শুধু ফিক্ করিযা হাসিল।

অমলা রাগিয়া বলিল,—হাসলে যে? ভদ্রলোকেব ভালোবাসবার প্রাণ আছে। তোমার মতো ইয়ে নয়।

বিশ্বেশ্বর আবারও হাসিয়া বলিল,—তা নয। কিন্তু তোমার এই প্রেমিক ভদ্রলোকটিকে আমি জানি। আমবা এক মেসে থেকে এম. এ. পড়তাম।

—তারপরে ?

বিশ্বেশ্বর এক মিনিট একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—তারপরের কথা জানিনে। দেখছি, এখনও পড়া শেষ হয় নি, এবং সেই মেসেই আছেন।

তা সবাই কি একেবারে পাস করতে পারে ?

—তা পাবে না। সবাই লম্বা-লম্বা চিঠিও লিখতে পারে না। কিন্তু রাত্রে মেসে না থাকাটাই খারাপ।

এবাব অমলা ভীষণ রাগিয়া গেল। এমন চমৎকার চিঠি যে লেখে তার ভালোবাসায় কোথাও ফাঁকি আছে এ কথা ভাবাও যায না। সে বিছানায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—সব মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা আমি বলি না, বলার দরকাবও হয না। বড় চিঠিও তাই লিখতে হয় না।

বিশ্বেশ্বর চলিয়া যাইতে ছিল, অমলা ডাকিল,—শোনো, শোনো।

বিশ্বেশ্বর চৌকাঠের গোড়ায় ফিবিযা দাঁড়াইয়া বলিল,—কি, বলো।

—তোমার কি আমাব কাছে বসতে গা জবালা কবে ?

বিশ্বেশ্বব একটু অপ্রস্তুত হইযা বলিল—না, না। বাইবে একটু কাজ আছে কি না!

—তোমাব যত কাজ বাইরেই ? আমি যে ঘবের মধ্যে একলাটি হাঁফিযে উঠি, আমার কাছে কি তোমাব কোনো কাজ নেই ?

- থাকবে না কেন? কিন্তু হিতসাধন-মণ্ডলীব—

হিতসাধন-মণ্ডলীর একটা জরুরী কাজ ছিল সত্যই। তবু পাঁচ মিনিট বসিলে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু পাঁচ মিনিট বসিলেই চলিবে না। অমলা সমস্তক্ষণ তাহাব স্বামীকে অধিকাব কবিয়া রাখিতে চায়। সেইখানেই তাব ভয়। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সরিয়া পড়িল।

অমলা একদৃষ্টে দ্বারের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিযা আবাব শুইয়া পড়িল। তাহার চোখ দুইটি জলে ভবিযা উঠিল।

নিচে হইতে তাহার শাশুড়ী বার কয়েক ডাক দিলেন। কিন্তু সে

সাড়াও দিল না, উঠিলও না। উপুর হইয়া শুইয়া শুইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। সেদিন বিশ্বেশ্বর আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহার মান ভাঙ্গাইয়াছিল। সেই একদিন মাত্র।

কিন্তু একটি দিনের সুখস্মৃতিতে মানুষের জীবন ভরিয়া ওঠে না। একজন চায় সমস্তক্ষণ তাহার স্বামীকে একচেটিয়া অধিকার করিয়া থাকিতে, সেবা দিয়া, শুশ্রূষা করিয়া, ভালোবাসিয়া স্বামীর এবং নিজের মুহূর্তগুলি মধুময় করিতে, আর একজনকে বাহিরের সহস্র কাজ ডাকে, তার নিশ্চিন্তে বসিয়া মধু-যামিনী যাপনের সময় নাই।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে মেঘ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। যে অমলা একটি চোখ এবং একটি কান বিশ্বেশ্বরের যাওয়া-আসার পথের 'পরে দিবারাত্র পাতিয়া রাখিত, বিশ্বেশ্বর পাশ দিয়া চলিয়া গেলেও আর সে ফিরিয়া চাহে না। ক্রমে এমন হইল যে, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন একজন আর একজনের সাথে কথাও কহিত না।

এমন সময় অমলা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইল। মধ্যে কয়দিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল, একটু কাশিও ছিল। তখন কেহ বড় খেয়াল করে নাই। অমলা নিজেও কিছুই জানায় নাই। যখন জানা গেল, তখন অনেক বেশি জ্বর।

হিতসাধন-মণ্ডলীর কাজ পড়িয়া রহিল। বিশ্বেশ্বর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মণ্ডলীর ছেলেরা মাঝে মাঝে শুশ্রূষা করিবার বায়না ধরিত। কিন্তু নিজের বাড়ির কাজে নিজের প্রতিষ্ঠানের ছেলেদের ব্যস্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না, তাহাদের বসিতেও দিত না। নিজে দিবারাত্রি ঠায় বসিয়া থাকিত। অমন সেবা করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। দিন নাই, রাত্রি নাই শিয়রের কাছে বসিয়া রোগিণীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা বড় সহজ নয়। অমলা যখনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে,

দেখিয়াছে দুটি স্নিগ্ধ আঁখি আকুল মমতায় তাহারই মুখের 'পরে নিবদ্ধ। সে তো চোখ নয়, যেন বিধুর হৃদয়ের আকুতি শুকতারায় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

কতবার অমলা তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইবার জন্য জেদ করিয়াছে। বলিয়াছে,—তুমি যাও, তুমি যাও,—কিছু ভয় নেই. আমি এখন বেশ আছি। কিন্তু তখনই জ্বরের ঘোরে সে কথা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের কোলের উপর দুখান হাত ফেলিয়া দিয়াছে। বিশ্বেশ্বর আর উঠিতে পারে নাই, সমস্ত রাত শীর্ণ হাত দুটি কোলের উপর লইয়া কাটাইয়া দিয়াছে।

এমনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। একুশ দিনের দিন অমলা পথ্য করিল। সেদিন সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত বিশ্বেশ্বর অমলার বিছানার একপাশে পড়িয়া যে ভাবে ঘুমাইল তাহার উপমা একমাত্র রামায়ণেই মেলে। অমলা রোগ-শয্যায় শুইয়াও না হাসিয়া পারিল না।

কিন্তু তারপর দিন সকালে উঠিয়া আবার যে-কে-সেই। অমলা তখনও চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। বিশ্বেশ্বর চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া তাহার কপালের উত্তাপ লইবার জন্য হস্তস্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। বিশ্বেশ্বর তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—ভালো বোধ হচ্ছে, না?

—হ্যাঁ। বলিয়াই অমলা তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল,—তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন বলো তো?

অমলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—সে আমি জানি নে। আমার অনেক অপরাধ। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।

চব্বিশ ঘণ্টা নিদ্রার জড়তা তখনও বিশ্বেশ্বরের কাটে নাই। এই একটা রাত্রে এমন কি ঘটিতে পারে ভাবিয়া না পাইয়া সে শুধু আচ্ছন্নের মতো বলিল,—মন্দ নয়!

অমলা তখনও বিশ্বেশ্বরের হাত ছাড়ে নাই। আবদারের ভঙ্গিতে বলিল,—না, তুমি বলো ক্ষমা করেছ?

বিশ্বেশ্বর হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, করেছি। যত সব—হুঁঃ!

অমলার সমস্ত মন এক অনির্বচনীয় আনন্দেব তরঙ্গে নৌকার মতো দুলিতে লাগিল। অসীম বিস্ময়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল,—এত বড় ভুল কেমন কবিযা সম্ভব হইয়াছিল? এমন শিবের মতো স্বামীকেও কেমন করিয়া ভুল বুঝিয়াছিল!

ফাল্গুনের উদাসী মধ্যাহ্ন। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নাই; কেবল একটা ঘুঘু একটানা ডাকিয়া চলিতেছিল। শীতের একটু আমেজ আছে। অমলা একখানা পুরু চাদর মুড়ি দিযা শ্রান্তভাবে শুইয়া ছিল। সমস্ত মধ্যাহ্ন একজনেব পদশব্দের প্রতীক্ষায চাহিযা চাহিযা কাটিযা গেল। নিচে কতবাব তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিন্তু বিশ্বেশ্বব উপরে আব আসিল না। দিনের আলো ধীরে ম্লান হইযা আসিল। আবও কিছু পবে আনন্দময়ী সন্ধ্যাদীপ লইয়া ঘরে আসিলেন। অমলা তখন দ্বাবেব দিকে পিছু ফিবিয়া শুইয়া।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা কবিলেন,—কেমন আছ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আনন্দময়ী ধীবে ধীবে তাহাব ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। ভালোই আছে দেখিযা নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার গায়ের উপর চাদর খানি ভালো কবিযা টানিযা দিলেন।

দিনের পর দিন যায়।

অমলা ধীরে ধীরে সুস্থ হইযা উঠিল। কিন্তু তার মনেব মধ্যে যে একটু ব্যথা রহিযা গেল তাহা আর কাহাবও দৃষ্টিতে পড়িল না। সে হাসে-খেলে, খায-দায, কিন্তু কিছুতে যেন তাহার মন নাই—সকলেব কাছেই কি যেন একটা সর্বদা চাপিয়া যায।

পাড়াব মেয়েবা বিকাল বেলায বেড়াইতে আসে। বিশ্বেশ্বরের সেবার

কথা বলিতে তাহারা পঞ্চমুখ। অমলা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে, কিছু বলে না। তাহারা রাগ করিয়া অমলার গাল টিপিয়া দেয়।

এই সময়টি বিশ্বেশ্বরের চা-পানের সময়। বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর হাঁকে,—মা, একটু চা খেতাম।

বিকালের দিকে আনন্দময়ীদের মজলিস বসে পাশের বাড়িতে। এই সময়টায় তিনি বাড়িতে থাকেন না।

অমলা তাড়াতাড়িতে নিচে নামিয়া আসে। এবং বোধ হয় তাহার সঙ্গিনীদের শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বলে,—মা তো বাড়ি নেই, দাসী উপস্থিত। আমার তৈরি চা কি চলতে পারে?

বিশ্বেশ্বর গোঁ গোঁ করিয়া বলে,—একটু তাড়াতাড়ি কোরো। আমার আবার—

পাড়ার মেয়েদের এই রহস্যালাপ শুনিতে বড় কৌতুক বোধ হয়। তাহারা উৎকর্ণ হইয়া সিঁড়ির আড়ালে বাঁকের মুখে যেখানটিতে আসিয়া দাঁড়ায় সেখান হইতে অমলাকে দেখা যায়।

অমলা হাত জোড় করিয়া বলে, তা আর জানি নে? আপনার অনেক কাজ। কিন্তু একটু স্থির হ'য়ে বসুন। চা করতে যতটুকু দেরি হয়, তার বেশি আমার দেরি হবে না। একটা আসন দোব কি?

বিব্রতভাবে বিশ্বেশ্বর দাওয়ার উপর বসিয়া পড়ে এবং বিড় বিড় করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টাও করে।

অমলা চা আনিয়া দে; সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরও কিছু রহস্য করে। বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া চা খাইয়া সরিয়া পড়ে। অমলা উপরে আসিতেই পাড়ার মেয়েরা তাহাকে লইয়া টানাটানি লাগায়। তাহাদের সঙ্গে সেও হাসে।

তার পরে—

সবাই যখন চলিয়া যায়, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে বিছানার উপর সে একেবারে লুটাইয়া পড়ে, চোখ ফাটিয়া হু হু করিয়া অশ্রু ঝরে।

তা ঝরুক। কিন্তু স্নান করিয়া আসিয়াই বিশ্বেশ্বর দেখে তাহার

কাপড়খানি কে অতি যত্নে কোঁচাইয়া সম্মুখেই রাখিয়া দেয়, জুতা জোড়ায় দু'দিন অন্তর কে চমৎকার করিয়া কালি দিয়া রাখে, পকেটের ময়লা রুমালের পরিবর্তে মাঝে-মাঝে ফর্সা রুমাল রাখিয়া দিয়া যায়—এমনি কত খুঁটি-নাটি বিশ্বেশ্বরেরও চোখে পড়ে।

কিন্তু তাহার তখন হিতসাধন-মণ্ডলী লইয়া নাওয়া-খাওয়ার সময় নাই। একদল ছেলে লইয়া সে তখন নূতন-নূতন স্কীমের খসড়া তৈরি করিতেছে, এবং সেই নূতন পরিকল্পনাটিকে কি করিয়া মূর্তি দেওয়া যায তাহাবই উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। চারিদিকের সহস্র সহস্র মূঢ় কণ্ঠে ভাষা ও ভগ্ন বক্ষে আশা জাগাইবার স্বপ্নে সে তখন বিভোর। একটি নারীর আকুলতা তাহাকে বাঁধিতে পারে না।

ছয় মাসের মধ্যে একটা নৈশ বিদ্যালয়, একটা লাইব্রেরী এবং কুস্তি করিবার একটা আখড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক সঙ্গে এই তিনটা খুলিয়া বিশ্বেশ্বরকে কম দুর্ভোগ পোহাইতে হয় না। নৈশ বিদ্যালযের ছেলে জোটানো বড় সহজ নয়। সকলেই চাষী লোক, সমস্ত দিন বৌদ্রে জলে মাঠের কাজ সারিয়া সন্ধ্যা বেলায় তাহারা একেবারে এলাইয়া পড়ে, পড়ায় মনঃসংযোগের শক্তি থাকে না। প্রতিদিন তাহাদের এক এক করিয়া ডাকিয়া আনিতে হয়। তাহার উপর ম্যালেরিয়ার কৃপাও আছে। এবং এই সমস্ত বয়স্ক লোকের স্মরণশক্তি এমনি তীক্ষ্ণ যে, উপর্যুপরি পাঁচ দিন অনুপস্থিত হইলে আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সে ধৈর্য সকলেব থাকে না। অনেকে কিছুদিন পরে হাল ছাড়িয়া দেয়। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাদের পিছনে যে পরিমাণ সাধ্যসাধনা করা হয় তাহাতে তাহাদের মনে হয়, গরজ যেন বিশ্বেশ্বরেরই। ইহাতে পড়িবার আগ্রহ যায় কমিয়া।

আর লাইব্রেরী। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের পড়ারও সখ নাই, চাঁদা দিবারও সখ নাই। তাহাদের লইয়া কোনো হাঙ্গামা নাই। তবে আর এক শ্রেণীর লোক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক চাঁদা দেয়, কিন্তু বই পড়িবার সখ নাই। ইহাদের কাছে

দুবারের উপর তিনবার চাঁদা চাহিতে লজ্জা করে। বিশ্বেশ্বর বুঝিয়াছে, ইহাদের চাঁদা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বিপদ বেশি তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের লইয়া। ইহারা বই নিয়মিতই পড়ে, কিন্তু চাঁদা দেয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে হাতের বই ফেরৎ না দিয়াই গা ঢাকা দেয়।

ইত্যবসরে কুস্তির আখড়ায় একটা ছেলে বে-কায়দায় হরাইজণ্টাল বার হইতে পড়িয়া গিয়া ডান হাতখানি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডান হাতখানি প্রায় অচল হইয়াই গিয়াছিল। এই ব্যাপারে বিশ্বেশ্বব তো খুনের দায়ে পড়িতে-পড়িতে বাঁচিযা যায়। বাঙালীর ছেলের কেরাণীগিরি করিযা খাইবার সম্বল ওই হাতখানিই। কুস্তি করিলে তো খাওয়া জোটে না। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গের চেযে ওই অঙ্গের মূল্যই বেশি।

কিন্তু ইহাতেও বিশ্বেশ্বর দমে নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে নারী-মঙ্গল সমিতির একটা খেয়াল তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল। সেদিন এই সমস্যার সমাধানকল্পে সে দুপুর বেলায অমলার শয়ন-কক্ষে গিযা উপস্থিত হইল। অমলা তখন গালে পান পুরিযা শুইযা-শুইযা একটা নভেল পড়িতেছিল। নভেল না পড়িলে তাহার ঘুম জমে না।

বিশ্বেশ্বর আসিতেই অমলা শয্যার উপর বসিয়া জোড়হস্তে বলিল,—কি আজ্ঞা করেন?

বিশ্বেশ্বর শয্যার এক প্রান্তে বসিযা সহাস্যে বলিল,—আজ্ঞা একটু আছে।

তারপরে গম্ভীর ভাবে বলিল,—দেখ, আমাদেব হিতসাধনমণ্ডলীর—বলিয়া অমলার পানে চাহিতেই দেখিল, অমলার চোখে একটু ভ্রূকুটি ঘনাইয়া উঠিতেছে। বলিল,—আচ্ছা, তুমি হিতসাধনমণ্ডলীর ওপর চটা কেন?

—চটা নই তো। তারপরে বলো,—

বিশ্বেশ্বর একটু দ্বিধা করিতে লাগিল। বলিল,—আমি ভাবছি, আমাদের মণ্ডলীর সঙ্গে একটা নারীমঙ্গল সমিতি খুলবো।

—কি মঙ্গল তাতে হবে?

—সে অনেক কথা বলতে হয়।

অমলা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল,—না, অনেক কথা শোনবার ধৈর্য আমার নেই। তুমি সংক্ষেপে বল।

—সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে, আমাদেব দেশের মেয়েদের সঙ্গে পৃথিবীর চিন্তাধারার যোগ-স্থাপন।

—আমাদের দেশের মেয়েদের ওপব তোমাব দযার অন্ত নেই। কিন্তু তাতে আমি কি কবতে পারি?

—তাতে যা কিছু কাজ সে তো তোমাবই। তুমি এ বিষযেব ভাব নাও।

অমলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপবে একটুখানি হাসিযা জিজ্ঞাসা করিল,—এই জন্যেই আজ দুপুরে তোমার শুভাগমন?

—হ্যাঁ। নেবে তুমি ভার?

—না। দেখ, তুমি আমার জীবন দিযেছ। সবাই বলে, তোমাব মতো অমন সেবা না কি নার্সেও কবতে পাবে না। আমিও অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু ও সব আমি পাবেবো না।

বলিযা অমলা পিছন ফিরিযা শুইযা পড়িল।

বিশ্বেশ্বর তাডাতাড়ি বলিল, -জীবন দেওযার কথা তুলো না। কৃতজ্ঞতারও কথা নয। কিন্তু দেশেব মেয়েদের জন্যে—

অমলা ঝাঁঝিয়া উঠিযা বলিল,—না, না, না। তোমাব পাযে পড়ি আমাকে আর জ্বালিও না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর আর কোনো কথা বলিল না। রাগ করিযা সেও উঠিযা চলিয়া গেল।

ঈশান কোণে মেঘ ওঠে এক টুকরা। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহাই কখন দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাহার আর ইতিহাস নাই।

অমলার মনে যে-মেঘের টুকরা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার পানে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টিই পড়ে নাই। এই ভারতের ভাবীকালের মহিমময়ী মূর্তি তাহার মনশ্চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার অন্তরের প্রেম অমলাকে নিঃশেষে দান করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, যেন ওদিকে আর তাহার কর্তব্য কিছু নাই। অমলার কাছে সে কখনও কোনো জিনিস দাবীও করে নাই, ভিক্ষাও মাগে নাই। তাহার কাছে যে অমলার দাবী করিবার কিছু থাকিতে পারে তাহাও সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। সুতরাং ঝড় যখন উঠিল, তখন বিশ্বেশ্বর বিরক্ত হইযা মনে করিল—এ আবার কি বিপদ! সে নিজেকে বিপদ হইতে দূরে সরাইযা লইল। কিন্তু যতই সে সরিযা যায, বিপদ ততই বেশি বাধে।

এ বিরোধে দোষ কাহার সে বিষযে এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যাহারা মিশিযাছে তাহাদের মধ্যে দুই মত আছে। একদল বলেন,—দোষ অমলারই। জমিদারের কন্যা বলিযা সে তো আর সকলের মাথা কিনিয়া রাখে নাই। মেযে মানুষের অত তেজ ভালো নয। এই দলে প্রবীণার সংখ্যাই বেশি।

পাড়ার ছোট মেয়েরা কিন্তু এ কথা মানে না। বলে,—তেজ আবার তার কোথায দেখলে? আমরা তো দিনরাত্রি মিশেছি, অমন সতীলক্ষ্মী দেখি নি। অত লাঞ্ছনা সইতো তবু বাপের বাড়ির নাম করতো না। বাপ তো নিযে যাবার জন্যে সাধাসাধি করতো। তা একটি দিন বাপকে তার দুঃখের কথা জানায নি।

এ কথা মিথ্যা নয। নিজের এতটুকু দুঃখের কথা জানাইযা মুখ নিচু করিবার মেযে অমলা নয। স্বামীর কাছেও একদিনের তরে কৃপা ভিক্ষা সে করে নাই। বেদনার দাহে তাহার অন্তর দিবারাত্র পুড়িয়াছে। গোপনে সে ছট্‌ফট্‌ করিযাছে তথাপি একটি দিন বলে নাই,—আমাকে তুমি দযা কর,—আর কষ্ট দিও না,—আমি আর পারি না।

তেজ ছিল বই কি! কিন্তু সে যেন বিদ্যুতের তেজ ঝিলিক মারিবার আগে পর্যন্ত বোঝা যাইত না।

এমন মেয়েকে লইয়া সমাজের মানুষ কি করিতে পারে? বিপুল মানব-সমাজে বিবাহ একটা বড় রকমের আপোষ। দু'টি মানুষে সম্পূর্ণ মিল হয় না। একজন কখনই আর একজনের সম্পূর্ণ মনের মতো হয় না। আমরা আপোষ করিযা দুঃখে-সুখে গৃহকর্ম করিয়া যাই। দোষ গুণ, ভুল ভ্রান্তি সমস্ত মিলিয়া যে-মানুষ, তাহাকে জীবনের সঙ্গী করিতে গেলে আর তো উপায় নাই। তাহার গুণকে আমরা ভালোবাসি,—তাহার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা দিয়া, ভালোবাসিয়া শোধন করিয়া লই। মনে করি, যেখানে আমাদের মিল সেইখানেই আমরা মিলিব। তাই বলিযা যেখানে মিল হইল না সেখানে বিরোধও করিব না।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর ও অমলার মধ্যে কোথায বিবোধ এবং কোথায মিল খুঁজিয়া না পাইয়া লোকে অবাক হইয়া যায়।

একজন তো ভোলা মহেশ্বর। কাছা-কোঁচার ঠিক নাই, কোথায কে বিপদে পড়িয়াছে তাহাকে উদ্ধাব করিতে হইবে; কাহাব ঘবে শুশ্রূষাব অভাবে, পথ্যের অভাবে, চিকিৎসাব অভাবে কে মবিতেছে তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন, হয তো নিজেব খাওযা হয নাই, কিন্তু ক্ষুধার্তেব মুখে অন্ন তুলিযা দিতে হইবে; যাহার কন্যাদায তাহাকে কোনো প্রকাবে দায়মুক্ত কবিয়া দিতে হইবে। মানুষেব বিপদেব শেষ নাই এবং সংসাবে বিপদগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাই বেশি। সুতবাং বিশ্বেশ্বরেব কোনো দিকে চাহিযা দেখিবাব অবসর নাই। এমন মানুষকে কি কেহ অপবাধী কবিতে পারে?

আর একজন পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দুঃখ হয় তো আছে, ব্যথাও আছে, কিন্তু বাহিরে তাহাব চিহ্নমাত্র নাই। রোগ-মুক্তির পরে সে যেন আরও প্রাণবতী হইযা উঠিল। সমস্ত ব্যথা প্রাণপণে অন্তরে চাপিয়া এমন ভাবে স্বামীসেবা আবম্ভ কবিল যে, সবাই বলিল,—হ্যাঁ, স্বামীসেবা যদি করিতে হয় তো এমনি করিয়া। স্বামীব তুচ্ছতম অভাবও ইহার দৃষ্টি এড়ায় না।

যাহারা শুধু চোখ মেলিয়া দেখে, মনের দলগুলি মেলে না, এমন

দু'টি প্রাণীর মধ্যে কোথায় জোড় মিলিতেছে না, কেবলি ফাট ধরিতেছে তাহা তাহাদের চোখে পড়িবে কি করিয়া! তর্ক যে যাই করুক, অমলার মৃত্যুতে সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

পাড়া-ঘরের ব্যাপাব,—এক বাড়ির খবর অন্য বাড়িতে জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু এই বাড়ির দু'টি মেয়েই এমন চাপা যে, সে বিষয়ে পাড়ার লোকের কোনো সুবিধা হয় নাই।

যেদিন দুপুবে বিশ্বেশ্বব রাগ করিযা চলিয়া গেল এবং অমলা পাশ ফিবিয়া শুইযা রহিল, তাহার পরদিন হইতেই যেন একটা পরিবর্তন দেখা গেল। আনন্দমযী বুঝিলেন. উভয়ের মধ্যে একটা কিছু হইয়াছে। কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূর ব্যাপারে কোনো কথা কহিতে তিনি সংকোচ বোধ করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কৌতুকই বোধ হইত,—একটু হাসিয়া চুপ করিয়া যাইতেন, কোনো কথা কহিতেন না। এবাবেও চুপ করিয়াই বহিলেন।

তিনি দেখিলেন, বিশ্বেশ্বর পাবৎ পক্ষে বাড়ি আসে না এবং প্রায় রাত্রি বাহিরেই কাটাইযা দেয়। জিজ্ঞাসা কবিলে বলে, মণ্ডলীর কাজ অত্যন্ত বাড়িযাছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন. সবই বাগের কথা। কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না। বরং নিজেব অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিযা মনে মনে হাসিলেন। পুরুষ মানুষ রাগ করিয়া কযদিন থাকিতে পারে!

অপর পক্ষে অমলা আর তেমন যত্ন করিয়া সকাল বেলা চা-জলখাবার তৈরি করিয়া পাঠাইয়া দেয না, জুতায় কালি দেয় না, কাপড় কোঁচাইয়া সামনে রাখিয়াও দেয় না। সে যেন সব বিষযেই উদাসীন,—নিজের বিষয়েও। তাহাব নিজেরও যেন আর কোনো বিষয়ে চাড় নাই; বসিয়া আছে তো বসিযাই আছে. কাজ করিতে করিতে কখন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিষা গিযাছে, নিজেই জানিতে পাবে না। এক সময়ে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলেই লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি কাজে মন দেয়। আবার ভুলিয়া যায, এমনি

করিয়া পাঁচ মিনিটের কাজে তার এক ঘণ্টা লাগে। আনন্দময়ী তাহার অবস্থাও দেখেন, কিন্তু তাহাকেও কিছু বলেন না। এমনি করিয়া মাসখানেক গেল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে বিশ্বেশ্বর কি একটা প্রয়োজনে উপরে আসিয়া দেখিল, অমলা দিব্য আরামে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে, আর নিচে মা ডাকিয়া মরিতেছিলেন। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

বলিল,—মা ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?

এই মা'টির প্রতি অমলারও শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। নববধূ অবস্থায় সে যখন আসে, শাশুড়ী তাহাকে মায়ের স্নেহে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে এখন পর্যন্ত তাঁহারই পায়ে পায়ে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়। দোষ করিয়া তিরস্কৃত হইলে কাঁদিয়া রসাতল করে, মাকে নিজের হাতে সেই চোখের জল মুছাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু বোধ হয় তার মন ভালো ছিল না,—অথবা অন্য যে কারণেই হোক, সেও রাগের উপর ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল,—না পাচ্ছি না। একশোবার আমি কারও ডাক শুনতে পাবো না।

ইহার পর উভয় পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অনেকগুলি রূঢ় কথা বলিল, যাহা তাহার মতো শিক্ষিত লোকের বলা উচিত হয় নাই,—এবং অমলাও সমান রূঢ় কথা বলিয়া তাহার উত্তর দিল। কিন্তু মেয়েদের সহিত ঝগড়ায় পুরুষ মানুষের কোনোদিন জিৎ হয় না। বিশ্বেশ্বরকে পিছু হটিতে হইল।

যাইবার সময় বিশ্বেশ্বর বলিতে বলিতে চলিয়া গেল,—মরণ না হ'লে আমার আর শান্তি নেই। বিয়ে ক'রে আমার নিজের অশান্তি নিজে ডেকে এনেছি।

অমলা কাঠ হইয়া হাতের মুঠা শক্ত করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

সে নিচে গিয়া রাত্রের রান্না শেষ করিল,—রাত্রে সে-ই রাঁধে। তারপরে

স্বামীর খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিল। আনন্দময়ী সেকালের সংসারের যত গল্প করিলেন তাহা শুনিয়া হাসিল। তিনি ঘুমাইলে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে যে খায় নাই তাহা আনন্দময়ী জানিতেও পারিলেন না।

তারপরে কি যে হইল ভগবান জানেন, সকালে তো ওই কাণ্ড!

ডাক্তারী পরীক্ষা করাইলে হয়তো মৃত্যুর কারণ জানা যাইত। কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। মৃত্যু হার্টফেল করিয়াই হোক, আর বিষপানেই হোক তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। তবে কার্যকারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া মনে হয়, ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষ-সংগ্রহের কোনো সুবিধা ছিল না, হার্টফেল করিয়া মৃত্যু হওয়াই সম্ভবপর।

[৭]

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আসিয়া বিশ্বেশ্বর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাধারণ কয়েদীর ওয়ার্ডে সে যে ভিতরে ভিতরে এত হাঁফাইয়া উঠিযাছিল, তাহা এই প্রথম টের পাইল।

লম্বা একখানা দোতালা বাড়ি; উপরে নিচে ছোট ছোট অনেকগুলি কামরা,—প্রত্যেক কামরায় একজন কবিয়া থাকিতে পাবে। একখানি লোহাব খাট, খড়ের গদি ও বালিশ এবং বিছানার চাদবেবও ব্যবস্থা আছে। বিশ্বেশ্বর মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—বাঃ!

সে খাটখানি ওদিকের দেওযাল ঘেঁসিয়া পাতিল, তাহার উপব গদি বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া সটান চিৎ হইযা শুইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই দৃষ্টি পড়িল, টেবিলটা অসজ্জিত অবস্থায় এক কোণে পড়িযা আছে। সে টেবিলটা ঘরের মাঝখানে টানিয়া আনিল, চেযাবটা তাহাব পাশে বসাইল, এবং যেই মনে হইল বেশ হইযাছে, অমনি তড়াক্ করিযা বিছানায শুইযা পড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে পা নাচাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় মনে হইল, ঘরে জানালা নাই তো। ও-বাড়িতে হল ঘর, কিন্তু বড় বড় জানালা ছিল, চারিদিকের বাড়ি-ঘর গাছপালা, আকাশ দেখা যাইত। আর কিছু না করিলেও অন্তত চিলমিথুনের জীবন-যাত্রা দেখিয়াও নিঃসঙ্গ দিনমান কোনোরূপে কাটিয়া যায়। এখানে সমস্ত দুপুর একেবারে একেলা, দিন কাটাইবে কি করিয়া ভাবিতেই শিহরিযা উঠিল।

বিশ্বেশ্বরের আর শোওয়া হইল না। উঠিয়া চেয়ারে বসিয়া ঘরখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। না, জানালা একটা আছে। যে দিকটায়

তাহার খাটখানি সেই দিকের দেওয়ালে, নাগাল পাওয়া যায় না এমন উঁচুতে জানালার মত শিক দেওয়া কি একটা দেখা যাইতেছে বটে। সে সোৎসাহে একেবারে টেবিলটার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে সকল উৎসাহ শুকাইয়া গেল। জানালা ঠিক বলা যায় না,—একটা বড় গবাক্ষ। কিন্তু তাহাতে এক প্রস্থ তারের জাল দেওয়া আছে, তাহার উপর বাহিরের দিকে একখানা কাঠের তক্তা এমন ভাবে ঢালু করিয়া দেওয়া আছে যে, আলো এবং বায়ু যদি বা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, আকাশের চিহ্ন মাত্র দেখিবার উপায় রাখা হয় নাই। তাহার সমস্ত মন হাহাকার করিয়া উঠিল,—একটি মাত্র গবাক্ষ! অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই কি এমনি করিয়া শাস্তি দিতে হয়? একটি জানালা রাখিলে ন্যায়ের বিধানের এমন কি অমর্যাদা হইত!

এই ওয়ার্ডে যখন সে প্রবেশ করে, তখনও টিক্‌টিকির ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ্ করিতেছিল। তাই চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার সময় পায় নাই যে, ইহার ঠিক পিছনেই আরও একটি ওয়ার্ড আছে। সে দুই হাত টেবিলের উপর বদ্ধাঞ্জলি করিয়া ভাবিতে বসিল,—ওই দেওয়ালই জেলের শেষ সীমানা। খুব সম্ভব উহার পিছনেই এক টুকরা মাঠ এবং তারপরেই জেলের শেষ উঁচু পাঁচীলটি। যদি ওইখানে একটা বড় জানালা থাকিত!—হয়তো বহির্জগতের কিছু দেখা যাইত—ট্রামের মাথার উপরকার ডাণ্ডাটি এবং হয়ত ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের মাথার পাগড়ীর কিয়দংশও, এই টেবিলের উপর দাঁড়াইলে তার শ্রান্ত, বিরক্ত মুখখানির কতকটা দেখিতে পাওয়াও অসম্ভব নয়।

এমন সময় নিচে দুপ্ দাপ্ করিয়া বহু পায়ের শব্দ উঠিল। এ শব্দ বিশ্বেশ্বরের অপরিচিত নয়। ছুটির পরে এমনি দুপ্ দাপ্ করিয়া কয়েদীরা ওয়ার্ডে ফেরে।

এখানে ফিরিঙ্গি এবং ভদ্র শ্রেণীর বাঙালী কয়েদীর বাস। কিন্তু হইলে কি হয়? ইহারা সাধারণ কয়েদীর অপরাধেই অপরাধী, এবং

সামাজিক আসন সাধারণ কয়েদীর চেয়ে যত উচ্চই হোক, মানুষ হিসাবে তাহাদের চেয়ে উচ্চ নয়। ইহাদের সহিত আলাপ করিবার আগ্রহ বিশ্বেশ্বরের কখনই ছিল না। সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে ওয়ার্ডার আসিয়া সকলের ঘরের তালা খুলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহাদের রাত্রির আহার্যও উপস্থিত। সকলে হুড়মুড় করিয়া নিজের নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং গায়ের জামা ও পায়েব জুতা কোনো মতে ছুঁড়িয়া ফেলিযা থালা লইয়া রাত্রের খাবারের অংশ লইতে ছুটিল।

সে এক তুমুল ব্যপার!—চীৎকার, কোলাহল ও হুড়াহুড়ি!

বিশ্বেশ্বরও থালা লইয়া খাবাবের অংশ সংগ্রহ করিয়া নিজের ঘবে আসিয়া বসিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল বলিয়াও মনে হইল না।

কিন্তু ঘরে আসিয়া বসিবার মিনিট দশেক পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলেক আসিয়া অতি সন্তর্পণে একটা চেয়ার টানিযা লইয়া বলিল,—এই যে! কেমন আছেন?

বিশ্বেশ্বর মুখে বলিল,—ভালো।

এবং অবাক হইয়া ভদ্রলোকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ময়লা রং, মাথার সুমুখের দিকে চুলের চিহ্নমাত্র নাই, মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, সুমুখের কয়েকটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, এবং বাকীগুলিও নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে। ভদ্রলোক এত সন্তর্পণে চলা-ফেরা করে যে, জুতার শব্দ পাওয়া যায় না এবং এমন ধীরভাবে চিবাইযা চিবাইয়া কথা বলে যে, মনে হয় অর্ধেক কথা চাপিযা গেল।

বিশ্বেশ্বরের মুখের পানে চাহিযা সে আপন মনেই একটু হাসিল। ভাবটা, তুমি যে আমাকে চিনিতে পাবো নাই তাহা আমি বুঝিয়াছি। এবং বুঝিয়াই বলিল,—আমার নাম ঘোষ, বাইরে মিঃ বি. বি. ঘোষ বলেই বিখ্যাত, তবে এখানে শুধু ঘোষ বললেই সবাই চিনবে।

বিশ্বেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল, সেই যাঁদের কালির—

ঘোষ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—কালি-ফালি না মশাই, এড্‌ভোকেট বি, বি, ঘোষ, হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্‌ করতাম।

হাইকোর্টের খুব বড় দু'চার জন ছাড়া কোন এড্‌ভোকেটকেই বিশ্বেশ্বর চেনে না, বিখ্যাত মিঃ বি, বি, ঘোষকেও না। সে বলিল,—ও।

ঘোষ মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার একবার মুখ নিচু করিয়া হাসিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আপনি অদৃষ্ট মানেন?

এ সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর কখনও কিছু ভাবে নাই। ইতস্তত করিতে করিতে বলিল,—তা—হ্যাঁ—মানে----

ঘোষ সগর্বে বলিল,—আমি মানি।

বলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বিশ্বেশ্বরের চোখের সুমুখে ধরিল, সব এই হাতে, বুঝলেন? কিছু এড়িয়ে যাবার উপায় নেই,—জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত।

ঘোষ করতলখানি নিজের চোখের সুমুখে রাখিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। এইবারে নিজের নিজের সেলে যাইবার সময়। বাহিরেও একটা হুড়াহুড়ি পড়িল। ঘোষ ধীরে সুস্থে চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল,—আচ্ছা, কাল এ সম্বন্ধে কথা কইব এখন। আজকে—

কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়াই আবার পিছন ফিরিয়া বলিল,—আচ্ছা আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন?

না।

খুব দুঃখিত ভাবে ঘোষ বলিল—জানেন না? ওটা শিখে রাখা ভালো।

তাহাকে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিতে উঠিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল—এখন তাই দেখছি।

—হুঃ। বলিয়া ঘোষ নিজের সেলে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ঘোষের অতি সন্তর্পণে চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। এমন সময় তাহাদের ওয়ার্ডের ওয়ার্ডার হঠাৎ সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে চমকাইয়া দু'পা পিছাইয়া গেল।

এই সার্জেণ্টটির উপরেই আবার ফাঁসীর আসামীকে ফাঁসী দিবাব ভার। কথা কহিবার আগেই লোকটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। ইতিপূর্বে সে মাত্র একজনকে ফাঁসী দিয়াছে। সকলে বলে, তাহাব পর হইতেই উহার হাসি বোগ হইয়াছে। উহা নাকি মস্তিষ্ক-বিকৃতিব পূর্বাভাস।

সার্জেণ্ট ফিক্ কবিযা হাসিযা তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—So you here! (তুমি এখানে!)

বিশ্বেশ্বর সসম্ভ্রমে বলিল,—Yes Sir. (হাঁ স্যাব।)

—Quite comfortable? (বেশ আরামে আছ?)

—Yes Sir. (আজ্ঞে হ্যাঁ।)

—That's alright. (বেশ, বেশ।)

সার্জেণ্ট হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

•

সে রাত্রি ভালো করিয়া বিশ্বেশ্বব ঘুমাইতে পারিল না। আগের ওয়ার্ডেও গান-বাজনা, হুল্লোর চলিত বটে, কিন্তু এমন বৈচিত্র্য সেখানে ছিল না। তাহাদের সাহস কম, সুতরাং এতদূব গলা উঠিত না, সবাই একটু চুপি চুপি সারিবার চেষ্টা করিত। এখানে তা নয়। সাধারণত যতটা রাত্রি মানুষ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ ইহারা চুপ কবিযাই থাকে, মানুষেব ঘুমাইবার সময় বুঝিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করে। সে চীৎকার যেমন মধুর, তেমনি বিচিত্র।—

মোটা গলাওয়ালা একটা লোক ডাকে গাধা, আর সঙ্গে সঙ্গে আর

একদল, কেহ কুকুর কেহ শিয়াল ডাকিতে আরম্ভ করে। মিনিট খানেক ডাকিয়া যেই ইহারা পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করে, কোণের ঘর হইতে একজন অতি মিহিকণ্ঠে বেড়াল ডাকিয়া উঠে, অমনি আবার বিবিধ জন্তুর স্তব-সাধনা আরম্ভ হয়। এমনি চলে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত।

সকালে দ্বারের তালা খুলিয়া দিতেই সকলে প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহির হইল। পায়খানার সংখ্যা বেশি নয়। সুতরাং পায়খানার দরজা হইতে উঠানের মধ্যস্থল পর্যন্ত একের পর একজন তীর্থের কাকের মতো প্রত্যাশী-নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে।

বিশ্বেশ্বর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই ঘোষ তাহার পাশ দিয়া নিচে নামিয়া গেল।

—এই যে! কেমন আছেন?

বিশ্বেশ্বর সহাস্য ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভালোই আছে।

—বেশ, বেশ।

ঘোষ অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর রেলিঙে ভর দিয়া নিচের সতীর্থদের সকৌতুকে দেখিতে লাগিল। তাহারা তখন উসখুস করিতেছিল। একজন ফিরিঙ্গি পিছন ফিরিতেই বিশ্বেশ্বরের উপর নজর পড়িল। সে অমনি একটা চোখ বন্ধ করিয়া জিভ্ বাহির করিয়া তাহাকে ভেঙ্চাইল। হয়তো ইহা আত্মীয়তাজ্ঞাপক রসিকতা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ভালো লাগিল না। সে বিরক্ত ভাবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সেদিন রবিবার;—কয়েদীদের ছুটি।

সকলের সঙ্গেই বিশ্বেশ্বরের পরিচয় হইল। ফিরিঙ্গিগুলো নেহাৎই অশিক্ষিত ও অভদ্র,—শুধু অশ্লীল রসিকতায় পটু। বাঙ্গালীর মতো চুপ করিয়া বসিয়া গল্প জমাইতে জানে না। দু' মিনিট বসিয়াই একবার সমস্ত বাড়িটা ছুটিয়া আসা চাই। ছুটির দিন তাহারা হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করিয়াই কাটায়।

জ্যোতিষার্ণব মহাশয় মন্দ লোক নয়। বয়স চল্লিশের মধ্যেই। চোখ

দুটি বেশ বড় বড় এবং প্রশান্ত, কিন্তু হাঁ-মুখটি সরু ও সুচল হওয়ায় মনে হয়, লোকটির মধ্যে চালাকী-বুদ্ধির অভাব নাই। লোকটি বড় বেশি কথা বলে, এবং নিজে যখন কথা বলে তখন অন্য কেহ কথা বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। ঘোষের যে অদৃষ্ট ও কর-রেখার উপর শ্রদ্ধা, হইয়াছে সে ইহারই কৃপায়। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে হংসমধ্যে এই দুটি মাত্র বক বাস করে। দীর্ঘদিন একত্র বাসের ফলে ইহারা কথায় বার্তায় একেবারে ফিরিঙ্গি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরের বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি এখনও যে মরে নাই তাহা একটু আলাপ করিলেই বোঝা যায়।

জ্যোতিষার্ণব জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়ের নাম?—যেন তাহার নিজের জ্যোতিষ-কার্যালয়ে বসিয়া আলাপ করিতেছে।

—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বেশ, বেশ। 'শ্রী'টুকু এখনো বাদ দেননি দেখছি। ভালো, ভালো। আজকালকার ছেলেরা আবার 'শ্রী' বলে না কিনা।

বলিয়া ঘোষের পানে চাহিল। ঘোষ মুখ নামাইয়া মুচ্‌কি হাসিল।

—কি করা হতো?

—বিশেষ কিছুই না। এম. এ. পাশ ক'রে—

জ্যোতিষার্ণব সাশ্চর্যে কহিল,—হুঁ? তোমারই জুড়িদার ঘোষ! দেখো দেখি, কি দুর্ভোগ!

ঘোষ বিষণ্ণভাবে শেলাইএর কলের ছুঁচের মতো মাথা নাড়িল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপরে জ্যোতিষার্ণব বলিল,—তোমাকে আর আপনি বলতে পারি নে, বিশ্বেশ্বর। একসঙ্গে অনেকদিন কাটাতে হবে। মিথ্যে কুটুম্বিতা করা। তুমিও বরং আমাকে তুমিই বলো।

বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল,—না না। আপনি—

—হ্যাঁ। তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়! কিন্তু কি জানো, জেলের মধ্যে এসে বয়েসটাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি।

ঘোষ আস্তে আস্তে বলিল,—Civil death. (সিভিল ডেথ।)

জ্যোতিষার্ণব জিজ্ঞাসা করিল,—তার মানে?

ঘোষ কহিল,—তার মানে, সাধারণ মানুষের যে সমস্ত করবার অধিকার আছে, তোমার তা নেই। তুমি যদি আজকে কোনো দলিল সই করো, তোমার সেই সই গ্রাহ্য হবে না। আইনের চোখে তুমি মৃত।

—ঠিক বলেছ। আমাদের তাই বয়সও নাই। বয়স মানে কি? সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই যে সময়, তার আমরা নাম দিলাম 'দিন'। মহাকালকে এমনি খণ্ড খণ্ড কবে তার ওপর আমাদের অস্তিত্বেব চিহ্ন রেখে আমরা চলি। তখন আমরা বলি, আমরা এই একটি দিন বাঁচলাম—আমাদের বযস হোলো এত। সেই কালের থেকে আজকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি,—এ'কে যাবার কোনো চিহ্নই নাই।

জ্যোতিষার্ণবকে বিশ্বেশ্বরের বেশ লাগিল। এমন করিযা সে আলোচনা করে নাই।

জ্যোতিষার্ণব বলিতে লাগিল,—আমরা সবাই বযসের বাঁধন থেকে মুক্ত। ফল যতক্ষণ হাওয়ায় থাকে ততক্ষণ বলা চলে এইটে আগে এসেছে, এইটে পরে। কিন্তু হাওয়ার থেকে যখন তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে বায়ুবিহীন পাত্রে পুরলে অমনি তারা বয়সের হাঙ্গামা থেকে বে'চে গেল। তাদের সবাই হোল সবারই সমবয়সী।

বিশ্বেশ্বব জিজ্ঞাসা করিল—হাওয়ার থেকে ফলকে যারা বিচ্ছিন্ন করে তারা ভালো লোক। কারণ সেই ফল অনেক দূরের লোকের ভোগে লাগে। কিন্তু জগৎ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'বে কার কি লাভ?

ঘোষ বিস্মিত ভাবে কহিল,—পাপ কবেছ, তাব ফল ভোগ কববে না?

বিশ্বেশ্বর জোরেব সঙ্গে জবাব দিল,—না, কবব না। মানুষ পাপ কোনো দিন করে না—কবে ভুল। পথ চলতে গেলে এমন ভুল সে করবেই! বন্ধুজনে তার সেই ভুল সংশোধন ক'রে দেবে। কিন্তু একটা ভুল ক'রেছে ব'লে তার পথচলাই বা বন্ধ হবে কেন?—শাস্তিই বা সে পাবে কেন?

লজ্জায়, অপমানে এবং অনুশোচনায় ঘোষের মস্তিষ্কের অবস্থা বড় ভালো নয়। কথা কহিতে গেলে নানা বিভিন্নমুখী চিন্তা এমন ভাবে তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইয়া বসে যে, সুসম্বন্ধ আলোচনা তাহার পাল্লায় পড়িয়া অসম্বন্ধ প্রলাপে পরিণত হয়। কিন্তু আইনের কথা উঠিলেই তাহার মাথা কেমন পরিষ্কার হইয়া যায়। দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে পরিচ্ছন্ন রাস্তার সন্ধান পাইয়া তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। ফৌজদারী আইনে ঘোষের নামও ছিল, দখলও ছিল।

ঘোষ বলিল,—শাস্তি কেন পাবে তা আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি—তুমি যখন তোমার নিজের জিনিসটি হারিয়ে ফেল, তখন করো ভুল। তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যখন আমার জিনিসটি সরিয়ে ফেল, তখন করো পাপ। তখন তুমি আমার ওপর অন্যায় করলে। এই অন্যায়ের জন্য বৃহৎ মানব-সমাজের কাছ থেকে তোমায় শাস্তি নিতে হবে।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল, কেন হবে, সেই ত আমার প্রশ্ন। আমি রাগের মাথায় তোমার দাঁত দিলাম ভেঙ্গে। তোমার দাঁত ভাঙ্গবার আমার অধিকার নেই, এবং সুস্থ অবস্থায় কখনই তোমার দাঁতে হাতও দিতাম না। এর জন্যে দায়ী আমি নই,—দায়ী পারিপার্শ্বিক অনেকগুলি ঘটনা। আমার একটা বিশেষ মানসিক অবস্থায় তুমি নিশ্চয় এমন কতকগুলি ঘটনা এনেছ যাতে আমি ওই অপকর্মটি করতে বাধ্য হয়েছি। তার বদলে তোমার বৃহৎ মানব-সমাজ আমাকে দিয়ে মণ কয়েক তেল বার ক'রে নিলেন। কিন্তু সেই তেল তোমার ভাঙ্গা দাঁতের কোনো উপকারেই এল না।

ঘোষ বলিল,—আমার দাঁত সারাবার জন্যে তো তোমাকে দিয়ে ঘানি টানানো নয়। তোমার শাস্তি দেওয়া হোল, যাতে ভবিষ্যতে তুমি অথবা অন্য কেউ পরের দাঁতের ওপর হাত না চালাও।

—অর্থাৎ পরের দাঁতের ওপর হাত চালানই যেন মানুষের পেশা।

—নিশ্চয়ই। দাও তো একবার জেলগুলো ভেঙ্গে, আর আদালতগুলো

তুলে। দেখবে, মানুষের পক্ষে একটি দিনও পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। হয়তো তাই হ'য়ে উঠেছিল। আইন তো বিনা প্রয়োজনে হয় নি।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—অন্যায়ও মানুষ বিনা প্রয়োজনে করে না। ঘোষ, ঘানি টানা আর কি শাস্তি? এর আগে চুরি করার অপরাধে চোরের হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে, আ-কণ্ঠ মাটির মধ্যে পুঁতে অপরাধীকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে এবং আরও অনেক ব্যবস্থা হয়েছে যার নাম শুনলে আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায়। তবু পৃথিবীতে অপরাধের সংখ্যা কিছুমাত্র কমে নি এবং সাধু ব্যক্তিরা মানুষের সুমতি-সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে বানপ্রস্থও নেন নি। সবই সেই আছে, মাঝে থেকে আমাদের মতো কতকগুলো হতভাগ্য ঘানি টেনে, সতরঞ্চি বুনে আর ছোবড়ার দড়ি পাকিয়ে মরে।

ঘোষ বলিল, -মরুক দড়ি পাকিয়ে। ওরই মধ্যে মানব-সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে।

এবারে বিশ্বেশ্বর চটিয়া উঠিল। বলিল কী বারবার মানব-সমাজ, মানব-সমাজ করো। আমি এদিকে ঘানি টেনে মরি, তোমার মানব-সমাজের কল্যাণ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমি আছি, তাই তোমার মানব-সমাজ আছে। আমার কাছে এই পৃথিবীর কি মূল্য, যদি আমি নিজে এখানে না থাকি?

কিন্তু নিজের উত্তেজনায় বিশ্বেশ্বর নিজেই হাসিয়া ফেলিল। শান্তভাবে বলিল,—তাও যদি বুঝতাম, আমার খরচায় তোমার মানব-সমাজের কিছু কল্যাণ হোলোই না হয়। তাও তো নয়। ওই ওয়ার্ডে ছিলাম তো, মনে হোতো যেমন হরিহরছত্রের মেলায় রাজ্যের জানোয়ার এসে জড়ো হয়, ওখানে তেমনি সারা বাংলার মাতব্বর চোর জুয়াচোর গাঁটকাটার মেলা ব'সেছে। জেল কে বলে? এইখানেই নিখিল-বঙ্গ-বদমাইস-সমিতির হেড-আফিস। তুমি শাস্তির ভয়ের কথা কি বলছ, ঘোষ? ভয় শাস্তি পাওয়ার

আগে পর্যন্ত থাকে, একবার শাস্তি পেলে মানুষের ভয় যায় ভেঙ্গে,—জেল আর তার কাছে জেল নয়। দেখনি একটা অপরাধী ক'বার এখানে এসে ঢু' মেরে যাচ্ছে?

ঘোষ কিছুই দেখে নাই। সে খুব কঠিনমতো একটা জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ খেই হারাইয়া বলিয়া বসিল,—তুমি অদৃষ্ট মানো না তাহোলে?

অদৃষ্ট মানিলেও বিশ্বেশ্বরের যুক্তি দুর্বল হয় না। তথাপি সে বলিল,—না, মানিনে।

এত বড় কথার কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইযা ঘোষ শুধু সক্রোধে বলিল,—নাস্তিক!—এবং বিব্রত ভাবে জ্যোতিষার্ণবের মুখের পানে চাহিয়া (যদি সেখান হইতে কোনো সাহায্য আসে) ডাকিল,—পণ্ডিত!

পণ্ডিত খুব বুদ্ধিমানের মতো শিরসঞ্চালন করিয়া বলিল,—এই আলোচনা যদি সাধারণ অপরাধীর সম্বন্ধে হয়, তখন আমি ঘোষের সঙ্গে একমত। কিন্তু যখন নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করি তখন বিশ্বেশ্বর, তোমারই দলে। তবু কথা যখন উঠলো, তখন আমারও কিছু বলবার আছে। কিন্তু আমি যা বলছি, তা আমি নিছক তর্কচ্ছলে বলছি বলেই ধরে নিও;—আচ্ছা, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস করো, আমাদের এই শাস্তিভোগের কোনো প্রয়োজন ছিল না? সত্যই বিশ্বাস করো?

—করি। কারণ, কতকগুলি মুদ্রার বিনিময়ে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ভার যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে নিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা অভ্রান্ত নন। সুতরাং অনেক সময় চোর ছাড়া পায় এবং নির্দোষ ধরা পড়ে। এই সমস্ত নির্দোষ লোকের শাস্তিভোগের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল না। আর যে সমস্ত সত্যিকার চোর ধরা পড়ে, শাস্তি তাদের কোনো কল্যাণই করে না, সে তো তুমি জানো।

জ্যোতিষার্ণব বলিল,—কিন্তু আমার মতে শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে সবলের হাতে দুর্বলের লাঞ্ছনার অবধি থাকতো না। তুমি একটি নিরীহ, ভালো মানুষ ভদ্রলোক, স্ত্রী-পুত্র, জমিজমা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না

করছ,—আমার গায়ে জোর আছে, তারই বলে আমি তোমার সমস্ত কিছুর ওপর অধিকার স্থাপন করতাম। তুমি রুখতে কি দিয়ে?

—রুখতাম না। আজকেই কি পারি? আমি একজন জমিদারকে জানি, যে টাকার জোরে যা-খুসী তাই করে। কেউ তাকে রুখতে পারে না। প্রজাদের কাছে তার দাবীর অন্ত নেই। একজন প্রজা জেদ ধরলে দোর না। অনেক গুলো জাল দলিল তৈরী ক'রে জমিদার তার অনেকখানি জায়গা জোর ক'রে দখল করে নিলে। মামলা চললো—প্রথম আদালতে হারলো, তার আপীল হোলো সাবজজ কোর্টে। সেখানেও জমিদার হারলো আপীল হোলো জজ কোর্টে। তখন প্রজার এমন অবস্থা যে দিনের আহার মেলা কঠিন। তাকে হার মানতে হোলো, এবং অত্যন্ত হীন সর্তে। এমন ঘটনা অনেকই আছে। পণ্ডিত যার জোর আছে তার কাছে মাথা নিচু ক'রে চ'লেই দুর্বল বেঁচে থাকে। আইনের আগের যুগেও তেমনি ক'রে বেঁচেছে এখনও তেমনি করেই বাঁচে। এ ছাড়া আর পথ নেই।

জ্যোতিষার্ণব বলিল,—কিন্তু তখনকার চেয়ে এখনকার মানুষ কি অনেক বেশি সুখে নেই? শাস্তির ভয়ে কি অনেকে তাদের রিপু দমন করে থাকে না?

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল হয়তো থাকে, কিন্তু সে অল্পদিন। তারপরে শাস্তিকে এড়াবার কৌশল আবিষ্কার করে। রিপু তো মানুষের আছেই। কিন্তু সেই রিপু যিনি দিয়েছেন, রিপুদমনের শক্তিও তিনিই সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। মানুষ সত্যি-সত্যি রিপু দমন করে সেই শক্তি দিয়ে, আইনের ভয়ে নয়। তুমি আইনের ভয়ের কথা বলছ, কত লোক যে জেল নিশ্চিত জেনেও তহবিল তছরূপ ক'রে সেই টাকা গৃহিণীর কাছে রেখে হাসিমুখে জেল খাটতে আসে। তারা দেখে আজীবন না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে এ-ও ভালো।

জ্যোতিষার্ণব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—এই, এই,—তুমি একেবারে আমারই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলে যে!

বিশ্বেশ্বর লজ্জিত ভাবে বলিল,—তাই নাকি?

জ্যোতিষার্ণব ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—তাই।

তারপরে বেলার দিকে চাহিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—সে ইতিহাস আর এক সময় বলবো বরং। এখন চলো, স্নান ক'রে আসা যাক্। বেলা অনেক হ'য়েছে!

সেদিন দুপুর বেলা সকলে খাইয়া-দাইয়া বারান্দায় বসিয়া গল্প জমাইবার আয়োজন করিতেছে। ওদিকের কোণে চার জন ফিরিঙ্গি তাসে বসিয়াছে, মধ্যে দু'জন দাবা আরম্ভ করিয়াছে। লম্বা ছিপ্‌ছিপে ফিরিঙ্গিটা প্রতি-পক্ষের রাজাকে এমন একটা ঘোড়াব কিস্তি দিয়াছে যে, মন্ত্রীও ধরা পড়িয়াছে; আর এদিকে একপাশে বসিয়াছে ঘোষ, জ্যোতিষার্ণব ও বিশ্বেশ্বর। গল্প কেবল জমিয়া উঠিয়াছে·এমন সময় ঢং ঢং করিয়া পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিযা উঠিল।

তাস-ওয়ালাদের হাতের তাস টেবিলের উপব পড়িযা গেল, মন্ত্রী বেচারা কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়ার কবল হইতে বাঁচিযা গেল, সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের নিজের ঘরে দৌড় দিল। বিশ্বেশ্বর কিছুই বুঝিল না, তথাপি ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে সেই ঘণ্টার শব্দে তাহারও বুকের ভিতবটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করিয়া উঠিল। সেও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া অজানা আশঙ্কায চৌকিব উপর আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিচে তখন সিপাহী ও ওয়ার্ডার ভারি ভারি জুতার শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া সকলকে ঘরের বাহির না হইবার জন্য আদেশ দিতেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে গণ্ডগোল থামিয়া গেল। ওযার্ডার উপরে আসিতেই সবাই বাহিরে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—কি? কি? ব্যাপার কি?

ব্যাপার গুরুতরই;—

বেণ্টো ভাগিয়াছে।

একজন কনেষ্টবলের জিম্মায় বেণ্টো এবং আরও দশ বারো জন কয়েদী জেলের বাহির হইতে ইঁট পাথর জেলের ভিতরে বহিয়া আনিত। আজ সকালেও সে নিয়মিত কাজে গিয়াছিল, তারপরে আর ফিরিয়া আসে নাই। কিন্তু সে কথা জানাজানি হইল খাওযার সময়। যে কনেষ্টবলটি ইহাদের লইয়া যায, সে লইযা আসিবাব সময গণিযা আনে নাই। তাহাবও দোষ নাই। বাবো মাস চাকরী করে, ছুটির নাম নাই। তখন বসন্ত পড়িয়াছে, হয়তো কাছেই কোথাও একটা কোকিলও ডাকিয়া থাকিবে। হইলই বা কনেষ্টবল? পৃথিবীতে এমন কে পাষাণ আছে, যাব এমন অবস্থাতেও মন উদাস না হয়? সে একটা ইঁটের স্তূপের উপব পরমানন্দে উঁচু হইয়া বসিয়া খইনি টিপিতেছিল এবং পরদেশী বঁধুযা সম্বন্ধে গুন্ গুন্ কবিযা একখানা গজল ভাঁজিতেছিল। ইহার অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়াই বেণ্টো সরিয়া পড়ে। তখন কনেষ্টবল এ ব্যাপার টের পায় নাই। জেলের ভিতর আনিবার সময় যথারীতি গণিয়া লইলে টের পাইত নিশ্চযই। কিন্তু সেদিন তাহাব মন ভালো ছিল, তাছাড়া কোনোদিন যাহারা পালায় নাই, সেদিনই কি তাহারা পালাইবে? কনেষ্টবল 'গুণ্তি' করিবার আবশ্যকতাই অনুভব করে নাই।

ওয়াডার বলিল, এমন বোকা সে জীবনে কখনও দেখে নাই। বেণ্টোর মেযাদ শেষ হইতে আর মাস খানেক মাত্র ছিল। পাঁচ বৎসর যে নির্বিবাদে জেল খাটিল, এই একটা মাস সে আর সবুর করিতে পারিল না! কিন্তু সে পালাইবে কোথায? ধরা তাহাকে একদিন পড়িতেই হইবে, সেদিন তাহাকে দ্বিগুণ সাজা ভোগ কবিতে হইবে। কিন্তু বেণ্টোব জন্যে ওয়ার্ডারের দুশ্চিন্তা নাই, আজ হউক কাল হউক, এক বৎসব পরে হউক, বেণ্টোকে ধরা দিতেই হইবে। তাহার চিন্তা কনেষ্টবলটিব জন্য। লোকটি বড় ভালো ছিল। একটু ভুলের জন্য বেচারী জেল খাটিয়া মরিবে।

ওয়াডার বলিল—I am really sorry for the constable. (কনেষ্টবলটার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত।)

সে শিস্ দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সিঁড়ি দিয়া তর্ তর্ করিয়া নামিয়া গেল।

ওয়ার্ডারের দুঃখে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। পৃথিবীতে শতকরা নিরানব্বই জন লোকই এমনি করিয়া ব্যথিতের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং তারপরে শিস্ দিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া চলিয়া যায়। ইহার বেশি সে আর কিছু করিতেও পারে না যদিও ব্যথিতের ইহাতে বিন্দুমাত্র উপকারও হয় না।

ওয়ার্ডার চলিয়া গেলে বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। বেষ্টোদের সঙ্গে না মিশিলেও অনেক দিন একত্র বাসের ফলে ইহাদের উপর তাহার কেমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল। বেষ্টোর অলক্ষ্যে তাহার স্ত্রী ও কন্যার পলায়ন সংবাদ লইয়া কয়েদী মহলে যে কানাকানি ও হাসাহাসি চলিত, প্রীতিকর না হইলেও বিশ্বেশ্বরের তাহা কানে আসিত যদিচ এই সমস্ত আলোচনা রং ও ব্যঞ্জনায় সত্য ঘটনাকে ছাড়াইয়া যাইত।

ঘোষ বলিল—দেখলে পণ্ডিত এই এক আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা চার বছর এগারো মাস বেশ কাটালো একটা মাস আর কাটাতে পারলো না।

জ্যোতির্ষার্ণব বলিল আশ্চর্য বটে, কিন্তু বোঝা যায়।

--কি রকম?

জ্যোতির্ষার্ণব বলিল—চার বছর যখন কাটিয়াছে তখন ওর সামনে মুক্তির কোনো রূপ ছিল না যেমন আমাদের নেই। আমরা ভাবতেও পারিনে, কোনো কালে মুক্তি পাবো বাইরের সেই পরিচিত জনতা পরিচিত পথ-ঘাট আবার দেখতে পাবো। ভাবতে পারিও না, ভাবিও না। তারপরে দিন যত ঘনিয়ে আসে মুক্তির রূপও তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষের যে একটা মাস, সে যেন আর কাটতে চায় না, মুক্তির ক্ষুধায় সমস্ত মন হাহাকার করতে থাকে। সে ক্ষুধা একেবারে মানুষের আত্মার ক্ষুধা দেহটা পর্যন্ত দুর্বহ মনে হয়। তুমি জানো না ঘোষ, এই শেষের একটা মাসে মানুষ পাগল হ'য়ে যেতে পারে, তার অসাধ্য কিছু থাকে না।

ঘোষ বোধ হয নিজের শেষের দিনেব কথা ভাবিযাই, শিহরিযা উঠিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল, কিন্তু বেন্টোব বেলায বোধ হয ওকথা সত্যি নয়। এব আগেও বহুবার জেল খেটে গেছে, পবেও বহুবাব আসবে, ও বোধ হয জেলেই থাকে ভালো। এবং এবাবে মনে হয, ও খুনী আসামী হযেই আসবে।

ঘোষ আবাব শিহবিযা উঠিল- খুনী আসামী হযে?

—মনে হয।—বলিযা বিশ্বেশ্বব বেন্টোব লজ্জাকব পাবিবাবিক ইতিহাসেব যতটুকু জানিত বিবৃত কবিল। এবং তাবপবে বলিল বেন্টোকে দেখছেন তো? ও না কবতে পাবে পৃথিবীতে এমন অপকর্ম নেই। স্নেহ মাযা, মমতা বলে কোনো পদার্থ ওব মধ্যে নেই। অতি পবমাত্মীযকে খুন কবতেও ওব এক চুল বাধে না। স্ত্রীও ওব কাছে পবম সম্পদ ছিল না যে, তাকে ছেড়ে ওব বাঁচা বিড়ম্বনা হ'যে উঠবে। বেঁধে বেড়ে দেবাব একটা লোক, তা তাব জন্যে বাঙালী বেটাছেলেব আটকায না। ও ইচ্ছে ক'বলেই কাল আবাব একটা বিযে কবতে পাবে। আর সেই স্ত্রীও যে সতীশিরোমণি ছিল না, তা ও বেশ জানে। তবু সেই বিগত-যৌবনা স্ত্রীকেই ওব প্রযোজন। সেই জন্যে হযতো ও খুনই কববে।

ঘোষ বিজ্ঞেব মতো বলিল, ওব পৌরুষে ঘা লেগেছে। আমি জানি কিনা।

ঘোষ আবাব কি জানে? দু'জনেই বিস্মিত ভাবে ঘোষেব পানে চাহিল। ঘোষ সেদিকে না চাহিযা বলিতে লাগিল,—

- ছেলে বেলায আমি খুব দুর্বল ছিলাম। তাই ভাযেদেব চেযে বোনেদেব সঙ্গেই আমার খেলা জমতো বেশি। এই দেখে মা একদিন খুব ধমক দিলেন এবং বাবাকে বললেন, এই ছেলেটা দিনবাত্রি মেযেদেব সঙ্গে খেলা ক'বে ক'বে যেন মেযেলি হ'যে উঠছে। বাস! সেই যে পৌরুষে ঘা লাগলো, আব কোনোদিন মেযেদেব ছাযা মাড়াতাম না। এমন কি, ওবা যদি ডাকতো, আমি ফিরেও চাইতাম না,—বুক ফুলিযে অন্যদিকে চলে যেতাম।

দু'জন শ্রোতাই হাসিয়া ফেলিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—পৌরুষে যদি ঘা লাগতো, তা-হোলে অনেকদিন আগেই লাগতো. যখন ও প্রথম জানতে পাবে. ওর স্ত্রীব চবিত্র বিশেষ ভালো নয়। ওরা এমন একটা বেষ্টনীতে বাস কবে. যেখানে চবিত্রের ভালোমন্দেব কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ঘোষ চটিযা বলিল.--মাথাই যদি ঘামায না তবে খুন করতে ছুটলো কিসেব জন্যে ?

বিশ্বেশ্বব একটু ভাবিযা যেন আপন মনেই বলিল--বোধ কবি ওব নীড়ে ঘা পড়েছে। ওব নিজেব চবিত্র ভালো নয়. ওব স্ত্রীবও নয়. মেযেবও নয়। এবং সম্ভবত বাকী ছেলেমেযেগুলিব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ও খুব আশান্বিত নয। কারও পরে কোন মমতাও যদি ওব না থাকে. দোষে গুণে সবাই মিলে ওই নীড় বেঁধেছে. তাব সঙ্গে ওব নাড়ীব যোগ আছে। সেই নীড় ওরই অস্তিত্বের একটা অংশ। সেইখানে যে ঘা পড়েছে সে ঘা ওব নাড়ীতে বেজেছে। তাই ও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

জ্যোতিষার্ণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা বলিল.--তা হবে।

নীড়ের কথা উঠিতেই ঘোষ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িযাছিল। পাষাণ পুরীর মধ্যে বসিয়া গৃহের কথা শুনিলে সকলেরই মন উধাও হইয়া ছোটে। গৃহ বলিতে যাহা বোঝায, ঘোষেব তাহা নাই। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া পিতার এক বন্ধুব গৃহে তাহার বাইশ বৎসর কাটে। চল্লিশ বৎসব পর্যন্ত অর্থোর্জন করা ছাড়া আব কোনো চিন্তাও কবে নাই। যৌবনেব প্রান্তে আসিয়া প্রথম নারীব রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েকমাস মাত্র। শ্রীমতী শাশ্বতী মিত্র তখন এম. এ. পাশ করিযা একটি মেযে ইস্কুলেব মাস্টাবী করিত। কিছুদিন তাহাব পিছনে ভিক্ষাপাত্র বহিয়া বেড়াইবাব পর একদিন শাশ্বতী সদয হইল। বিবাহেব দিন পর্যন্ত স্থিব হইয়া গেল। এমন সময় এই গ্রহের ফেব। শাশ্বতী কোথায আছে. কেমন আছে তাহাব কিছুই ঘোষ জানে না। শুধু শুনিযাছে. পঁচিশ বৎসর যাহার পুরুষের

সাহচর্যের কোনোই প্রয়োজন হয় নাই, বিবাহের সব ঠিক হইয়া যাইবার পর ঘোষ যখন জেলে গেল, তখন পাঁচটি বৎসর সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। পরের বৎসরই কোথাকার একজন ডাক্তারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

নীড়ের কথায় ঘোষ কি ভাবিতেছিল কে জানে। সে বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি ডস্টয়েভস্কির "ইডিয়ট" পড়েছ?

—পড়েছি।

ঘোষ একটু থামিয়া বলিল,—আমার সেই প্রিন্সটির মত সবুজ গাছের নিচে মরবার সাধ হয়। অথচ সবুজ গাছের নিচে বসলেই মনে হয়, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে মানুষের মন সরে কি করে!

ঘোষ আপন মনে বকের মতো মাথা নাড়তে নাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘোষকে ইহারা কেহই বুঝিতে পারে না।

গত রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের মন ভালো ছিল না। সকাল বেলায় ঘরের মধ্যেই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহার মৃতা স্ত্রীকে—ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে যেন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, আর অমলা যেন তাহার পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তথাপি তাহার নিদ্রা আর ভাঙ্গিতেছে না। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, স্পষ্ট বুঝিল সত্যই পা-তলার দিকে কে কাঁদিতেছে। তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই একটা বেরাল চমকাইয়া লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের সমস্ত শরীর ভয়ে ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

তাই বটে! জীবনে যাহার চেয়ে প্রিয় কেহ নাই, মরণের পরে সে কাছে দাঁড়াইয়া আছে ভাবিতেই মানুষের ভয়ের সীমা থাকে না। এমনই বটে!

এই বেরালটি নির্দিষ্ট কোনো এক ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। হয়তো রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, কাজ করিতে যাওয়ার পথে কোনো কয়েদী টপ্ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আধ মিনিট আদর করিয়া নামাইয়া দিল। আর একজন হয়তো তাহাকে কাঁধে তুলিযা খানিক দূরে লইযা গিয়া ছাড়িয়া দিল। বেশি আদব পাইত যমদূতের মতো একটা পেশোযারীব কাছে। এই পেশেযাবীটিও একজন কযেদী। কযেকজন দুর্দান্ত কয়েদীকে সায়েস্তা কবিতে না পাবিযা যখন সিপাহীবা হাল ছাডিযা দিযাছিল তখন এই লোকটি এমন নৃশংসভাবে তাহাদেব শাসন কবে যে, পুবস্কাব স্বব্প তাহার পব হইতে তাহাকে আব শাবীবিক গুবু পবিশ্রম কবিতে হইত না, এমন কি মেযাদও কিছুদিন কমিযা গেল। পেশোযাবীটি ঘণ্টা মাফিক চোখ পাকাইযা, দাড়ি ফুলাইযা এবং অশ্রাব্য গালাগালি দিযা কযেদী শাসাইযা বেড়াইত এবং অবসর সমযে একটা গাছেব ছাযায বসিযা বেবালটিকে খেলা দিত। তখন ইহাব কুশ্রী মুখখানিই এমন মাধুর্যে ভবিযা উঠিত যে, কে বলিবে এই লোকটিই বাকী সময বাঘের চেযেও হিংস্রভাবে ঘ বিযা বেডায। পেশোয়ারীটি চলিযা যাওযাব পর হইতে ইহাব যত্ন কিছু কমিযাছে। অমন কবিয়া বারে বারে নানা প্রকাবেব আহার যোগাইতে আব কেহ পাবে না। তবে এখনও খাওযাব সময উপস্থিত থাকিলে সকলের কাছেই কিছু না কিছু মেলে।

ইনিই কখন আসিযা বিশ্বেশ্ববেব খাটেব উপব কম্বলেব নিচে পা-তলাব দিকে শযন করিয়াছিলেন!

বিশ্বেশ্ববেব ভয গেল বটে, কিন্তু মন কেমন এক অজ্ঞাত ব্যথায টন্ টন্ করিতে লাগিল।

চুপ কবিযা বসিযা সে অমলাব কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময দোর গোডায নবী নওয়াজ আসিয়া প্রথমে উঁকি মাবিযা এবং তাব পরে মলিন দন্তশ্রেণী বাহিব কবিযা চুপি চুপি তাহাব দিকে আগাইযা আসিল।

এখানে আসার পর হইতে পুরাতন বন্ধুদের কাহারও সহিত

বিশ্বেশ্বরের দেখা হয় নাই, দেখা করার সুযোগও নাই। কেবল নবী নওয়াজই মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার 'তালাস' লইয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কি খবর নবী নওযাজ? এত সকালে যে?

নবী নওযাজ সে কথার উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া বাহিরে উঁকি দিয়া আর একবার দেখিয়া লইল কেহ কোথাও আছে কিনা। তারপরে চট্‌ করিয়া এক টুকরা কাগজ বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল - শীগ্‌গির পড়ে ফেলুন।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ের সঙ্গে কাগজখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নবী নওযাজের হাতে দিতেই সে চট্‌ করিয়া তাহা জামার নিচে কোমরের দিকে কোথায় লুকাইয়া ফেলিল এবং বিশ্বেশ্বরের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মহম্মদ ইস্‌মাইল কে?

- আমার জামাই -কাম্বেলে পড়ে।

সে লিখেছে বাড়ির খবর সব ভালো। আর রহিম শেখের সঙ্গে তোমাদের যে মামলা চলছিল তাতে তোমাদের জিত হয়েছে। শীগ্‌গির তার সম্পত্তি ক্রোক ক'রে খেসারৎ আদায় করা হবে।

নবী নওযাজ আনন্দের উত্তেজনায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল,--তুমি কি এই জন্যে ভোরবেলাতেই এখানে ছুটে ছুটে এসেছ? ওখানে কি পড়াবার লোক ছিল না?

নবী নওযাজ জিভ্‌ কাটিয়া বলিল ও ব্যাটারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে, গোপনে বাইরে থেকে চিঠি আনিয়েছি, তা হলে কি আর রক্ষে রাখবে? এক্ষুণি জেলারের কাছে লাগিয়ে দেবে।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত ভাবে বলিল,—তাই নাকি? তাতে ওদের লাভ?

সে কথা ব্যাটাদের বোঝায় কে? সে বুদ্ধি থাকলে কি আর ঘানি ঘুরিয়ে মরে।

তা বটে। বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—তা যেন হোল। কিন্তু বাইরে থেকে চিঠি তুমি আনলে কি করে?

নবী নওয়াজ একটু সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বলিল,—বছর খানের যাক্, গেলে আপনিই বুঝবেন।

অকস্মাৎ নিচে ভীষণ কোলাহল উঠিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া দেখিল, অনেকগুলো ফিরিঙ্গি কয়েদী 'জন' নামক একটা ছোকরা-বয়সী ফিরিঙ্গি কয়েদীকে এই মারে তো এই মারে। ছোকরাটা একেবারে বোকা বনিয়া গিয়াছে এবং একবার ইহার পানে, একবার উহার পানে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া আত্মসমর্থনের জন্য একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সবাই মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই বলিয়া গালাগালি দিতেছে।

সকলের চেয়ে রাগিয়াছে রোবেরা,—বেঁটে গুণ্ডা গোছের একটা ফিরিঙ্গি। একটা লোক তাহাকে টানিতে টানিতে ভিড়ের বাহিরে আনিয়া যেই ছাড়িয়া দিতেছে অমনি সে জ্যামুক্ত গুল্তির মতো আবার ছিট্‌কাইয়া ভিড়ের মধ্যে পড়িতেছে। তাহাকে সামলানোই সব চেয়ে বেশি কঠিন।

অবশেষে গোলমাল থামিল। কয়েকজন মিলিয়া ফিরিঙ্গি ছোকরাটিকে সরাইয়া লইয়া গেল। আক্রমণকারীর দলও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আপন মনে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া একে একে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

খামকা এতগুলো লোক কেন একজন নিরীহ বেচারীকে খুন করিতে উদ্যত হইল বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সবাই এক সঙ্গে হিন্দী ও ইংরাজিতে গালি দেয়, সবাই কহে,—মারো শালেকো। সেই বাক্যের ঝড়ে ভিতরের ব্যাপার উদ্ধার করা দুরাশা। বিশ্বেশ্বর কোনো মতে শুধু এইটুকু বুঝিল যে, এই কাণ্ডের সহিত একটি রেবালেরও সম্পর্ক আছে।

সে উপরে চলিয়া আসিল।

বেরালের সহিত সম্পর্ক আছে সত্যই।

বিশ্বেশ্বরের কাছে তাড়া খাইয়া বেরালটি জনের ঘরে আশ্রয় লয়;—সম্ভবত আরও একটু ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল। জনের ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল নড়ানোর অভ্যাস আছে। নিদ্রা যাইতে যাইতে কখন চোখ মেলিতেই এই আন্দোলিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বেরালের দৃষ্টিতে পড়ে। অভ্যাস বশেই হোক, আর কৌতূহল বশেই হোক বেরালটি ডান পা বাড়াইয়া তাহাতে আঁচড় দেয়। জন আঁতকাইয়া উঠিয়া পড়ে এবং সুমুখেই বেরালটিকে দেখিয়া খপ্ করিয়া তার টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া দোতলা হইতে নিচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাতেই এই শোচনীয় কাণ্ডের উৎপত্তি।

তখন নিচে ছিল গ্রিফিথ্। সে স্পষ্ট দেখিয়াছে বেরালটি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া গেল। নিশ্চয়ই তাহার খুব লাগিয়াছে।

জন তাহা স্বীকার করে না। সে বলে—বেরালটি কখনই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালায় নাই। দোতলা হইতে ফেলিয়া দিলে বেরালের পা ভাঙ্গে না। সে ছেলেবেলায় অমন কত বেরাল ফেলিয়া দিয়াছে একটারও পা ভাঙ্গে নাই।

এমন সময় বোবেরো আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল,—তোমাকে ওপর থেকে ফেলে দিয়ে দেখা যাক, তোমার পায়ে লাগে কি না। বলিয়া জনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

জন দুর্বল মানুষ। তার গায়ে কেহ হাত দিলেই সে রাগিয়া আগুন হয়। সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল —বেশ করেছি ফেলেছি। তোমার কি?

ইহার পর মানুষে মানুষে হাতাহাতি হইতে কতক্ষণ?

ঘোষ বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—বেরালটি বড় ভালো ছিল।

পণ্ডিত বিস্মিত ভাবে বলিল, -'ছিল' মানে? বেরাল কি মারা গেছে নাকি? আমি তো শুনলাম একটা পা নাকি ভেঙ্গে গেছে।

ঘোষ বলিল,—সেই হোল। জনের ও কাজটা ভালো হয় নি।

রোবেরো বলিল,—জন একটা রোগ্,—দয়া মায়া ব'লে কোনো পদার্থ ওর শরীরে নেই। একটা নিরীহ বেরাল--

এবং তারপরে ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের পেশী টিপিয়া বলিল,--আজ ওকে শিক্ষা দিয়ে দিতাম। তোমরা না এসে পড়লে আমি ঠিক ওকে খুন করে ফেলতাম--Upon God (ঈশ্বরের শপথ)! বলিয়া পিক্ করিয়া খানিকটা থুথু ফেলিল।

রোবেরোর মায়া-মমতা আছে।

পণ্ডিত বলিল,—তোমার সেদিনের সেই কথা হে, বিশ্বেশ্বর। আমি এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম যে, অপরাধ মানুষ করবেই। সেই অপরাধের বিচারের ভার যদি শাসন-প্রতিষ্ঠান না নেয় লোকে নিজের হাতেই নেবে নেবে এই রোবেরোর দল। এবং বেরালের প্রতি মমতা এদের যতই থাক মানুষের প্রতি এদের কেমনতরো দরদ, সে তো চোখেই দেখলে!

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া কহিল - তাই দেখলাম। এবং তাতে আমার কথারই জোর বাড়লো। দেখলাম, আইন এবং বিচারালয় থাক বা না থাক, মানুষ বিনা বাধায় অন্যায় ক'রে যেতে পারে না। তুমি যদি বুঝে থাকো, বেরালের প্রতি মমতায় ওরা মানুষের প্রতি নির্মম হ'তে যাচ্ছিলো তা হোলে ভুল বুঝেছ। মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের যে সংস্কার আছে, এ তারই প্রকাশ মাত্র। এই সংস্কার থাকার পরও মানুষ যখন অন্যায় করে, তখন তার ওপর ক্রোধ হয় না, হয় কৃপা। মনে হয়, বহু দুঃখেই সে অমন অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছে।

ঘোষ প্রশ্ন করিল,—আর যারা জন্ম-অপরাধী?

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল,—তারা যে ব্যাধিগ্রস্ত। কুপথ্যের ওপরই রোগীর লোভ বেশি। ওদেরও লোভ অপরাধের ওপরই বেশি। সমস্ত জীবন ওরা বিকারের ঘোরে কাটিয়ে দেয়। কি করবে? নিজের ওপরে ওদের কোনো দখল নেই। কিন্তু এই রকমের জন্ম-অপরাধী তুমি ক'জন দেখেছ?

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,--জেলের কথাই বলি। এই জেলে দিবারাত্র যে কাণ্ড চলছে, একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখছ? --বাইবের থেকে ভেতরে ক্রমাগত চিঠি চলাচল হচ্ছে,--বিড়ি, সিগারেট গাঁজা, মদ যা চাও সবই এখানে মিলছে, শুধু দ্বিগুণ দাম দিতে হয়,-- একটা জিনিস তো একটু বাইবে বাখাব উপায় নেই, একটু অসাবধান হয়েছ কি তোমাব জিনিসটি উধাও। জেলে বসে মানুষ একদিনে যে অপবাধ কবে বাইবে দশ বছবেও তা কেউ কবে না। হবে না কেন? চাবিদিকেব সহস্র বাধা-নিষেধ-শাসনেব চাপে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আব কেবলি ফাঁকি খুঁজতে থাকে। এবং আমাব মনে হয়, দশ-বাবো টাকা মাইনে দিয়ে যাদের এদেব ওপব খবদাবি কববাব জন্যে বাখা হয় দু'পয়সা উপবিব লোভে ফাঁকিব বুদ্ধি যোগায় তাবাই। তোমাব কথাই ধবো, ঘোষ,--তুমি একজন বিখ্যাত এড্‌ভোকেট--

ঘোষ নতমুখে মুচ্‌কি হাসিয়া মৃদু-মৃদু সম্মতিসূচক ঘাড নাড়িল।

-বিদ্যায় বুদ্ধিতে, শিক্ষায়, রুচিতে সামাজিক মর্যাদায় তোমাব চেয়ে ঢের কম, দু'বছব আগে সে হয় তো তোমাবই বাড়িতে দাবোয়ানীব জন্যে উমেদাব ছিল, সে আজ তোমার শাসন-কর্তা, দুবেলা তোমায় চোখ বাঙিয়ে যাচ্ছে। তাব ফলে তোমাবও আত্মমর্যাদা-জ্ঞান গেছে ক'মে, ওরই কাছ থেকে দু'টাকাব জিনিস একটাকায় কিনতে তোমাব একটুকুও লজ্জা বোধ হয় না।

ঘোষ ইহাব প্রতিবাদে কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বব কহিতে লাগিল,-শুধু ও কেন, আবও ওপবে যাও; আমাদেব যে জেলাব তাব একমাত্র qualification (গুণ) সে ইংবেজ, অথবা আইবিশ, অথবা এমনি একজন শ্বেতাঙ্গ। কাল আমাব কাছে একটা চিট্ পাঠিয়েছিল তাতে ছ'লাইনে তিনটে বানান ভুল, এমন কি কোথায় বড অক্ষব, কোথায় ছোট অক্ষব বসে তা পর্যন্ত জানে না। সামান্য একটা সার্জেণ্ট--অথচ একেই দেখে--

এমন সময় ছড়ি ঘুরাইয়া স্বয়ং জেলার সাহেব। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।

প্রতি নমস্কারে ছড়িটা নাকের ডগায় ঠেকাইয়া জেলার সহাস্যে বলিল, —বিশ্বেশ্বর!

—Yes Sir.। (হ্যাঁ, স্যার।)

—তোমার আজ একটা interview (ইণ্টারভিউ) আছে। তোমার মা আসবেন। বিকেল পাঁচটার সময়।

বিশ্বেশ্বরের শুষ্কমুখে স্বস্তিব আভাস ফুটিযা উঠিল। যাক্ তাহা হইলে তাহাদের আলোচনা সাহেব শুনিতে পায নাই। ববং সুসংবাদ, - মা আসিতেছেন। সে প্রফুল্ল মুখে সাহেবকে ধন্যবাদ দিল।

জেলার চলিয়া গেল।

তাহার মা আসিতেছেন,—তাহার সংযতবাক্, শুচিস্মিতা, মা আনন্দময়ী। এই কারাগারের কুশ্রী প্রভাত অকস্মাৎ শারদপ্রভাতেব মতো ঝল্মল্ কবিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের মন শিশুর মতো নৃত্য করিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, আমার মা, আমার মা, আমার চিরকালের মা,—আজকে তিনি আসবেন।

কিন্তু কখন? কখন তিনি আসবেন? বিকেল পাঁচটা আজকে কখন হবে?

বিশ্বেশ্বর কাজ করিতে করিতে কেবল ঘড়ির দিকে চায়। কাঁটা যেন আর ঘুরিতে চাহে না। বিশ্বেশ্বর প্রাণপণে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করে,—পারে না। ঘড়ির কাঁটা তাহার চোখ দুইটাকে কেবলি টানে।

এখন ন'টা। দশটা—এগারোটা—বারোটা—এখনও আট ঘণ্টা। তাহার মনে হইল, হৃদ্‌পিণ্ড এমনি করিয়া লাফাইলে সে আটঘণ্টা কিছুতেই বাঁচিবে না।

পাশের টেবিলে কাজ করিতেছিল গ্রিফিথ।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—জানো গ্রিফিথ, আজকে আমার মা আসবেন দেখা করতে।

বিশ্বেশ্বর আপন মনে বলিল,—আমার মা, আমার মা।

গ্রিফিথ কাজে ব্যস্ত ছিল। মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল,—তাই নাকি?

বিশ্বেশ্বর সোল্লাসে কহিল,—হ্যাঁ। পাঁচটার সময় আসবেন।

কথাটা বিশ্বেশ্বর একটু জোরেই বলিয়াছিল। একটা সিপাহী ধমক দিয়া হাঁকিল,—এইও! আস্তে।

বিশ্বেশ্বর ভয়ে-ভয়ে কাজে মন দিল। কিন্তু গ্রিফিথ ঘাগী লোক, এই জেলে তাহার অনেকদিন কাটিয়া গেল। সে মুখ ভেঙচাইয়া সিপাহীর ধমকের জবাব দিল। সিপাহী দেশী লোক,—উপরওয়ালার হুকুম না পাইলে শ্বেতাঙ্গ কয়েদীকে কিছু বলিতে সাহস করে না। সুতরাং গ্রিফিথের রসিকতায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ওখানে বিশ্বেশ্বরের সুবিধা হইল না।

ওয়ার্ডে ফিরিতেই পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিল,—পণ্ডিত, আজ বিকেলে আমার মা আসচেন যে।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—শুনলাম। কিন্তু এই খরচপত্র ক'রে আধ-ঘণ্টার জন্যে দেখা করতে আসার কি যে লাভ, বুঝিনে।

বিশ্বেশ্বর শশব্যস্তে বলিল,—বলো কি পণ্ডিত! এই আধ ঘণ্টার মূল্য কি কম? এও যদি না থাকতো—

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—কি হোতো তাহোলে?—মরে যেতাম?

—মরা? মরেই তো আছি। জানো পণ্ডিত, আমার মনে হচ্ছে, আজকে আবার আমি নতুন ক'রে জন্ম নিলাম। মানুষের জীবনের মূল্য কত, আজ আমি যেমন টের পেলাম এমন আর কোনো দিন পাই নি।

পণ্ডিত তাহার পানে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—কিন্তু মায়ের সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা করবে না?

—লজ্জা কেন করবে? মায়ের সামনে দাঁড়াতে আমি কোনোদিন লজ্জা পাই নি। আজ পাব কেন?

—পাবে না? ওই পোষাকে দাঁড়াতে?

—পোষাকের পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বরের মুখ ছোট হইয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া বলিল,—তা হোক্‌গে।—এবং আর এক মিনিটও না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মনে মনে হাসিল,—ছেলেমানুষ! এখনও ভাবালুতা যায় নাই!

কিন্তু একটু পরেই বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল। কহিল আচ্ছা, তোমার লজ্জা করে?

—না।

বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পণ্ডিত বলিতে লাগিল,—কেন করবে শুনি? কি করেছি আমি? ওদের এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল। আমি সে টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে আর একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। যেদিন হিসেবে ধরা পড়লো, স্পষ্ট বললাম, হ্যাঁ, ও টাকা আমি নিয়েছি। আমার হলো জেল। তাতে হয়েছে কি? লোকে বললে, বেটা চোর। হিংসায় বললে—কারণ টাকাটা আমি মারলাম, তারা পারলে না। কিন্তু যেদিন আমি বাইরে গিয়ে ওই এক লাখ টাকা হাতে নিয়ে বসবো, দেখবে, ওরাই দু'বেলা আমার বৈঠকখানায় ব'সে চা-চুরুট খাবে, আর আমার স্তুতিবাদে পাশের লোকটিকে হারাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। খবরের কাগজে আজকে যারা আমার নিন্দা করেছে, কালকে তারা তাদের কাগজে ডিরেক্টার হবার জন্যে সাধাসাধি করবে। তোমায় আমি নিমন্ত্রণ ক'রে দেখাবো।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু এই কলঙ্ক? এতো যাবে না।

—না যায় তো থাক্‌। বিশ্বেশ্বর, কলঙ্ক নেই কার? যাঁদের লোকে মহাপুরুষ বলে, যাঁদের কোনো কলঙ্ক না থাকাও অসম্ভব নয়, তাঁদের নামেও

মানুষ মিথ্যে কলঙ্ক রটনা করে, নইলে সে স্বস্তি পায় না। একটা মানুষ তার চেয়ে বড় হবে, এ সে সইতে পারে না। অথচ বড় হওয়ার সাধনা করতেও সে রাজি নয়। এই সাধনা আমি করেছি;—রাজা, মহারাজা, বড়-লোক, কারও চায়ের টেবিলে, কারও বালাখানায় প্রত্যহ হাজিরা দিয়েছি, প্রত্যহ দাঁত বার করে হেসেছি, প্রত্যহ একবার করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, চন্দ্র-সূর্যের জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের মতো জ্ঞানী, গুণী, মহাশয় ব্যক্তি আর হয় নাই, হবে না। কিন্তু এতেও টাকা মেলে না; সহজে কেউ টাকা দেয় না। বড়লোকের পকেটে টাকা বাজে, তারই শব্দে মক্ষিকা জোটে। সবাই শুধু শব্দ শুনে বাড়ি আসে, মধু অদৃষ্টে জোটে না। তোমায় কি বলবো বিশ্বেশ্বর, প্রত্যহ নিজের ওপরে ধিক্কার জন্মেছে, তবু থামি নি। থামি নি বলেই আজ আমি লক্ষ টাকার মালিক।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—কিন্তু সৎ উপায়েও তো অর্থোপার্জন করা যায়।

পণ্ডিত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—ছেলেমানুষ! উপার্জনের বাজার তো দেখো নি। কি করবে তুমি? চাকরী? দু'বেলা মানবের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকতে হবে। একটু মাথা নেড়েছ কি,—ব্যাস জবাব। আর যদি বলো ব্যবসা, সেখানেও একই অবস্থা! মাল দিয়ে টাকা নিচ্ছ, তবু পেয়াদা থেকে বড় সাহেব পর্যন্ত সবাইকে ঘুঁস দিতে হবে। নইলে সাহেব আর একজায়গায় মাল নেবে, একাউণ্টাণ্ট বিল পাশ করতে দেরি করবে, ক্যাশিয়ার টাকা দিতে দেরি করবে।

অবশেষে পাঁচটা বাজিল।—

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তখনও নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারে নাই। সে হাফ্‌প্যাণ্ট ছাড়িয়া একটা বড় পেণ্টালুন পরিয়াছে, গায়ের উপর একটা গলাবন্ধ কোট। এবং এই জেলের পোষাক পরিয়া কি করিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল। তিন মাস পরে আজ প্রথম তাহার

মনে হইল, সে অপরাধী সত্যই অপরাধী। এমন করিয়া মাথা নিচু করিয়া মায়ের কাছে দাঁড়ানো যায় না।

মনে হইল, মা না আসিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

একটু পরেই আপিস হইতে ডাক আসিল,—তাহার মা দেখা করিতে আসিয়াছেন।

ভাবিবার সময় নাই। বিশ্বেশ্বরকে চলিতে হইল।

আপিস ঘরে কম্বলের উপর বসিয়া আছেন তাহার মা, সঙ্গে গুণেন্দ্র।

তাহার মাই বটেন, শুধু সুমুখের চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে. অনেকটা রোগাও হইয়াছেন,—কিন্তু সেই দুটি ঠোঁট, শান্ত অথচ দৃঢ়,—সেই আয়ত নীল চক্ষু, তাহাতে যেন বেদনার মেঘের ছায়া নামিয়াছে,—তাহারই তপস্বিনী মা।

বিশ্বেশ্বরের সব ভুল হইয়া গেল,—এই জেলের আপিস ঘর, তাহাব জেলের পোষাক, সুমুখে চেয়ারে উপবিষ্ট ডেপুটি জেলারের মিলিটারী গোঁফ, সমস্ত ভুলিয়া ছোট ছেলের মতো ছুটিয়া মায়ের একান্ত সন্নিকটে বসিল।

আনন্দময়ী মুহূর্তের জন্য একবার কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নীরবে বিশ্বেশ্ববের চুলেব মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

গুণেন্দ্র এমনি একটা মুহূর্তের আশঙ্কা করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—সেই সকালে বেরিয়েছি, বিশুদা, আর ষ্টেশন থেকে সটান ট্যাক্সি ক'রে এখানে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন পাঁচটা বাজতে মিনিট কযেক দেবি। আবার সাতটায় ট্রেণে চড়বো, বাড়ি পোঁছুবো ভোর বেলাতেই ধবো। জ্যাঠাইমার তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই,—আজ একাদশী। যত বিপদ আমাকেই নিয়ে।

বলিয়া অনাবশ্যক হা হা করিযা হাসিতে লাগিল। কিন্তু আনন্দময়ী ও বিশ্বেশ্বর কেহই কোনো কথা কহিলেন না।

গুণেন্দ্র বলিতে লাগিল,—আমারই কি আসা হোতো বিশুদা। কালকে আবার হিতসাধন-মণ্ডলীর বার্ষিক উৎসব কি না। দেখছি পেঁৗছে বিশ্রাম করবারও সময় পর্যন্ত পাবো না। জানো বিশুদা, আমাদের নারী-মঙ্গল-সমিতি বেশ জ'মে উঠেছে। জ্যাঠাইমা নিজেই তার ভার নিয়েছেন।

বলিয়া জ্যেঠাইমার পানে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহিল।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু এ সমস্ত কথায় কোনো আগ্রহই দেখাইল না। বলিল,—তোমার বাবা এখন কোথায়?

—তিনি সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে বদলী হ'য়েছেন।

—তুমি সেখানে যাও নি?

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—কি ক'রে যাই? তুমি নেই, আমিও যদি দেশে না থাকি তাহ'লে তো মণ্ডলীর চিহ্ন মাত্র থাকবে না।

এতক্ষণে আনন্দময়ী কথা কহিলেন,—ও কি বলে জানিস বিশু? বলে, রাম বনে গেছে, জ্যাঠাইমা, এখন ভরতের রাজত্ব। রাম-রাজত্বে ত্রুটি থাকলেও মানায়, কিন্তু ভরতের রাজত্বে এতটুকু ত্রুটি থাকলে চলবে না।

আনন্দময়ী সস্নেহে গুণেন্দ্রকে কাছে টানিয়া বলিলেন,—আর জানিস বিশু, তোর আর বৌমার একখানা ছবি নিয়ে ওরা একটা জলচৌকির ওপর বসিয়েছে। সন্ধ্যা বেলায় ওরা সেই ছবির সামনে ব'সে স্বদেশী গান করে। এই এক মাসে ও অনেক টাকা তুলেছে, নটবরের দলই দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল,—নটবরের দল?

হা হা করিয়া হাসিয়া গুণেন্দ্র বলিল,—দিয়েছে কি সাধে! তোমার জেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল এমন ক্ষেপে গেল যে, ওর ভয় হোল, কখন ওর ঠ্যাংটি তারা দেবে ভেঙ্গে। সেই ভয়ে ও রাত্রে বের হোতো না। এবারে যেমন চাঁদা চাইতে যাওয়া একেবারে নগদ পাঁচখানি দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিলে। তুমি বেরিয়ে এসে দেখবে, মণ্ডলীর নিজের বাড়ি পর্যন্ত হ'য়ে গেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন,—তা হবে। ওর বাবাই তো দিচ্ছেন পাঁচশো

টাকা, কিশোরগঞ্জে যাবার আগে ওর বাপ-মা দেশে এসেছিলেন কি না। ওর মা তো দিনরাত্রি আমার কাছেই থাকতো। যাওয়ার দিন বলে গেল,— আমি তো ওব কৈকেয়ী জননী দিদি, ওকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। তুমি বিশুকে যেমন মানুষ করেছ, ওকেও তেমনি মানুষ করে তুলো।

একটু থামিয়া আনন্দময়ী বলিলেন,—ওর বাবা বললেন,—আমি বিশুর কথা ভাবছিনে বৌদি, আমি ভাবছি বৌমার কথা। এই মণ্ডলী না—কি, এরই জন্যে মা আমার তিল-তিল ক'রে নিজেকে নষ্ট ক'রেছেন। আমি পাঁচ শো টাকা দিতে পারি, যদি তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা হয়। মণ্ডলীর যে বাড়ি হবে, গুণেনবা ঠিক ক'রেছে তাব নাম হবে "অমলা-ভবন।"

বিশ্বেশ্বর আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিল,—না, না।

গুণেন্দ্র চটিয়া বলিল,—না কেন?

এই 'কেন'র উত্তর বিশ্বেশ্বর দিল না। প্রিয়জনের স্মৃতি বহিবাব দুঃখ যে কত গুণেন্দ্র তার কি জানে? সে তো ছেলেখেলা নয়, সমারোহ করিয়া স্মৃতিফলক বসানো নয়,—সমস্ত জীবনব্যাপী সে এক দুশ্চব তপস্যা। কাল সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছাইয়া দিতে চায়, একটি সমগ্র জীবন তারই বিরুদ্ধে উজান মুখে অচল, অটল দাঁড়াইয়া থাকা কি সহজ?

কিন্তু বিশ্বেশ্বর অন্য কথা পাড়িল, মায়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—কিন্তু তুমি যে বুড়ো হ'যে যাচ্ছ মা, তোমার চুল তো পাকতে আরম্ভ করেছে।

আনন্দময়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—তা পাকবে না? বয়েসও হচ্ছে যে। আজ চুল পেকেছে, কাল দাঁত পড়বে, পরশু—

বিশ্বেশ্বর তাঁহার দুটি হাত চাপিয়া ধরিযা বলিল—পরশুর কথা আর বোলো না মা, ওই দাঁত পড়া পর্যন্তই থাক্।

ডেপুটি জেলার আসিয়া জানাইল, সময় হইযা গিযাছে।

আনন্দময়ী এবং গুণেন্দ্রের উঠিতে মন সরিতেছিল না। তবু উঠিতে হইল। কত কথা বলিবার জন্যই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। কিই বা বলা হইল।

যাওয়ার সময় বিশ্বেশ্বর গুণেন্দ্রকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

গুণেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

জেল-ফটকের ছোট্ট দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্র যখন পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

[৯]

তারপর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর এখন ধীর, স্থির, প্রিয়ভাষী নয়। এখন সে কথায় কথায় ঘুসি পাকায়, একটু রাগিলে ইংরাজি, হিন্দী ও বাঙ্গালায় অনর্গল গালাগালি দেয় এবং বিকাল বেলায় ছুটির পর অন্য সকলের সঙ্গে গলা ধরিয়া সুমুখের উঠানে বেড়াইয়া বেড়ায়।

তীক্ষ্ম বুদ্ধির জন্য পণ্ডিতের উপর প্রথম হইতেই তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহার রসজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়াছে। অশ্লীল বাঙলা গানের পণ্ডিত একটি অফুরন্ত উৎস বিশেষ। ঘোষকে বাহির হইতে শান্ত-শিষ্ট পাগল পাগল দেখায় (অবশ্য মাথায় একটু ছিট ঘোষের আছে), কিন্তু একেও কম বলা যায় না। রাত্রে সেই তো মিহি গলায় বেবাল ডাকে। বিশ্বেশ্বর প্রথম যখন আসে, তাহার রকম-সকম দেখিয়া সবাই একটু সাবধানে চলিত। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই সে ব্যবধান কখন যে উঠিয়া গেল, কেহ টেরও পাইল না।

এখন ঃ

পণ্ডিত ডাকে,—ও বিশু, যাস্ কোথায়? শোন্ না।

বিশ্বেশ্বর না ফিরিয়াই বলে, কি বলো।

পণ্ডিত খোসামোদের সুরে বলে,—আহা শোনই না। বলিয়া গান ধরে—

ও ললিতে, আমার একটা দুখের কথা শোন্,—
বুঝি বাধার তরে ছাড়তে হোলো রসের বৃন্দাবন।

ঘোষ টেবিল চাপড়াইয়া যোগান দেয়, মরি হায়রে!

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলে, আচ্ছা, আমি নিচে থেকে আসছি।

পণ্ডিত তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলে—আর নিচে কেন, বাবা? নিচে তো কেউ নেই। তোমার 'মিরাণ্ডা' ওপরেই রবার্টের ঘরে। টেবিল, চেয়ার কত কি যে ফেলছে এইখানে ব'সে শুনতে পাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর যাইতে যাইতে অবজ্ঞার স্বরে বলিল, Pooh! মিরাণ্ডা!

মিরাণ্ডা মেয়ে নয়, ষোলো সতেরো বছরের ছিপ্‌ছিপে সুন্দর একটি ছেলে। নাম একটা কি আছে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর এবং তার দেখাদেখি সবাই, তাহাকে মিরাণ্ডা বলিয়া ডাকে। মিরাণ্ডা বয়সে ছেলে মানুষ, কিন্তু সয়তানী বুদ্ধিতে অন্য সবাই তাহার কাছে শিশু।

খাবার আসিলে সে সর্বাগ্রে নিজের ইচ্ছামতো ভালো ভালো জিনিস-গুলি (অর্থাৎ উহারই মধ্যে যাহা ভালো) লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা বাকী থাকে, তাহাই সকলের মধ্যে ভাগ হয়। ওয়ার্ডার দাঁড়াইয়া হাসে। বিড়ি, সিগারেট তাহাকে কিনিতে হয় না। খুসীমত কাহারও পকেট হইতে বাহির করিয়া লয়।

বিশ্বেশ্বর হয় তো শুইয়া আছে, (এখন সে ধূমপান করিতে শিখিয়াছে) মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার আলনায় টাঙানো কোটের পকেটে হাত দিয়া কতক-গুলো সিগারেট বাহির করিল। বিশ্বেশ্বর ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি নিচ্ছ পকেট থেকে?

মিরাণ্ডা হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া বলিল, সিগারেট।

বিশ্বেশ্বর ডাকিল, এদিকে শোনো।

টেবিলের ওপারে দাঁড়াইয়া মিরাণ্ডা বলিল, কি বলো। তাহার চোখে দুষ্টামির হাসি।

বিশ্বেশ্বর ইসারায় তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল। সে তেমনি-ধারা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বিশ্বেশ্বর তাহাকে ধরিবার জন্য বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর হাসিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মিরাণ্ডা এমনি খুনসুড়ি করে সকলের সঙ্গে সমস্ত দিন।

ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের চমৎকার দিন কাটে। মাঝে মাঝে কিসের জন্য তাহার মন হাহাকার করিযা ওঠে, নির্জন গৃহকোণে তাহার মন কোন্ সুদূরে উড়িয়া যায়। কিন্তু তখনই হয় তো পণ্ডিত দোরগোড়ায দাঁড়াইয়া একটা রসের গান ধরে, নয় তো ঘোষ আসিয়া কানের কাছে ডাকে, মিউ!

বিশ্বেশ্বর প্রথমটা চমকাইযা ওঠে, আগন্তুকের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিযা চায। কিন্তু তখনই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ওঠে, তাহার হাসির শব্দে ঘর ফাটিবার মতো হয়। পাশের ঘরগুলি হইতে সকলে চীৎকার করে, Shut up. তারপর তাহারা নিজেরাও হাসিযা ওঠে।

সেদিন সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর সূর্যাস্তের কিছু আগে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। বর্ষণক্ষান্ত মেঘে মেঘে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে। এবং তাহারই আভা আসিয়া পড়িয়াছিল সুমুখের কৃষ্ণ-চূড়ায় ও তৃণাচ্ছন্ন আঙ্গিনায, জেলের লাল পাঁচীলে এবং সর্বত্র। অভিশপ্ত কারাগার সেদিন সন্ধ্যায যেন হাসিয়া উঠিল।

মিরাণ্ডা ও বিশ্বেশ্বর তখন উঠানটিতে পায়চারী করিযা বেড়াইতেছিল। অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়িল মিরাণ্ডার মুখের উপর রক্ত মেঘের আভা পড়িয়া তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানি অপরূপ হইযা উঠিয়াছে। বিশ্বেশ্বর সেই মুখখানি মেঘের দিকে উঁচু করিয়া অনেকক্ষণ নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। পায়ের নিচের পৃথিবী একবার টলিযা উঠিযা ধীরে ধীরে অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। তাহার শিরায় শিরায় পুলকের তরঙ্গ বহিতে লাগিল

মিরাণ্ডা ঠোঁট ফুলাইযা বলিল,—যাও।

বিশ্বেশ্বরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল, পায়ের নিচের মাটি পায়ে বাজিতে লাগিল.. কি বিশ্রী! সে মিরাণ্ডাকে দূরে ঠেলিযা দিযা নিজেও দু'পা পিছাইয়া আসিল। বলিল—তুমি যাও।

মিরাণ্ডার রাত্রের সিগারেট নাই। সে আব্দার করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বর চীৎকার করিযা বলিল—যাও!

তাহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মিরাণ্ডার আর সিগারেট চাহিতে ভরসা হইল না, ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বরের সমস্ত দেহ অজানিত আবেগে কাঁপিতে লাগিল। নিজেকে সে যেন আব ধরিষা বাখিতে পাবে না। মনে হইল এই ভিজা ঘাসেব উপর মুখ গুঁজিয়া শুইযা যদি সে কাঁদিতে পাবিত, তাহা হইলে বাঁচিযা যাইত।

পিঞ্জবাবদ্ধ সিংহের মতো বিশ্বেশ্বব অনেকক্ষণ উঠানময় পাযচাবি কবিযা বেড়াইতে লাগিল। অনেক দিন পবে আজ আবাব তাহার নূতন কবিযা মনে হইল, সে বন্দী, সে বন্দী।

কৃষ্ণচূড়া গাছটি তখনও সূর্যাস্তরাগে ঝলমল কবিতেছিল। বিশ্বেশ্ববেব মনে পড়িল, বহুদিন আগে,—সেদিনও শ্রান্তবর্ষণ মেঘে-মেঘে অস্তরবিব আভা পড়িযাছিল। ছাদের উপর একখানি চেয়ার লইয়া বসিয়া সে দূরের মাঠে কাঁচ ধানের তবঙ্গাযিত পাতায বর্ণ-শোভা দেখিতেছিল। কি কারণে অমলাও যেন ছাদে আসিযাছিল,—হয তো তাহারও মনে সোনালি আলোর স্পর্শ লাগিযাছিল। তাহার ছিল বুঝি একখানি বুটিদার টিযা রঙের শাড়ি। কতই যেন ব্যস্ত এমনি ভাবে বাব কযেক তাব কাছ দিয়া ঘুরিযা ফিবিযা অবশেষে সে যখন চলিযা যাইবাব উপক্রম করিল, তখন খপ্ করিয়া বিশ্বেশ্বর তাব শাড়ির প্রান্ত ধবিয়া ফেলে।

অমলা ব্যস্ত ভাবে বলিযাছিল,—ছাড়ো—

সে হাসিযা বলিয়াছিল,—না।

সেদিনে তাহাব চোখে হাসি ছিল, বুঝি যাদুও ছিল। অমলাব সমস্ত দেহ আনন্দে টলমল করিয়া উঠিযাছিল। তাহার পানে ভালো কবিয়া চাহিতে পারে নাই। নতনেত্রে অস্ফুট স্বরে শুধু বলিয়াছিল,—কত কাজ বাকী আছে।

বিশ্বেশ্বর অমলাকে কাছে টানিয়া গাঢ় স্বরে বলিযাছিল,—তোমার এমন

রূপ আর কোনো দিন দেখিনি। অমন ক'রে মুখ নামাও কেন? আমাকে দেখতে দাও,—দেখতে দাও।

অমলা মুখ তোলে নাই,—তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া অকারণে বড় কান্না কাঁদিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর কি তাহার কানে কানে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা আবৃত্তি করিযাছিল?

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের উঠানে দাঁড়াইয়া সে তাহাই স্মরণ করিবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিল।

অকস্মাৎ নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন চীৎকার করিয়া উঠিল,—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। কোনো দিন সে অমলাকে কাছে ডাকিযা প্রিয় কথা কহে নাই,—কোনো দিন বলে নাই, তোমার এত রূপ! টিয়া রঙের শাড়ী? কোথায় টিয়া রঙের শাড়ী? চোখের একান্ত সন্নিকটে যে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার দেহের পরে দৃষ্টিই কি কোনো দিন পড়িয়াছে?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—সে মিথ্যা। আমার অতীত জীবন শুধু একটা স্বপ্ন। সত্য এই জেল, সত্য এই জেলের জীবন।

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

দোতালার বারান্দার এক কোণে ঘোষ ও মিরান্ডা মুখোমুখি দু'খানা চেয়ারে বসিয়া কি যেন গল্প করিতেছিল, আর হাসিতেছিল।

এমন সময় বিশ্বেশ্বর আসিয়া মিরান্ডার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল এবং তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে টেবিলের উপর বসিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

—সিগারেট নেবে?

ভয়ে মিরান্ডার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না, অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের চোখের দিকে চাহিল।

বিশ্বেশ্বর একটা প্যাকেট সিগারেট তাহার কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

মিরান্ডা আস্তে আস্তে সেটা পকেটস্থ করিয়া বোকার মতো খানিকটা

হাসিল, বিশ্বেশ্বরও হাসিল। সাহস পাইয়া মিরাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কাছে 'হেজলিন' আছে?

—তোমার চাই? আচ্ছা, কালকে আনিয়ে দোব।

মিরাণ্ডা ভারি খুসী হইয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই কি খানিকক্ষণ ভাবিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, তোমার এমন চমৎকাব চেহারা, কোনো মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েনি?

মিবাণ্ডা লজ্জায লাল হইযা বলিল,- -না।

—পড়েনি? মিথ্যে কথা বলছ? বিশ্বেশ্বর বাগিযা গেল।

মিরাণ্ডা ভযে ভযে বলিল,—মিথ্যে নয়। সত্যি বলছি, পড়েনি।

—না পড়েনি! মিথ্যুক কোথাকাব!

বিশ্বেশ্বর জোবে জোরে ঘবের মধ্যে পাযচারি কবিতে লাগিল।

পরের দিন ভোরে প্রথমেই দেখা হইল পণ্ডিতের সঙ্গে। তখন তাহার চোখ জবা ফুলের মতো লাল। সে চোখ দেখিয়া পণ্ডিত ভয় পাইয়া গেল। কিছুদিন হইতেই বিশ্বেশ্ববেব মেজাজ খিট্‌খিটে হইযাছে। হাসিতে হাসিতে এমন অকস্মাৎ রাগিয়া ওঠে যে, সকলে কারণ খুঁজিযা না পাইয়া অবাক হইয়া যায়।

পণ্ডিত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার চোখ লাল হয়েছে যে! উঠলো নাকি?

বিশ্বেশ্বব প্রথমে বিবক্ত ভাবে বলিল,—না।

কিন্তু পরক্ষণেই পণ্ডিতের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ পণ্ডিত? একটু আমাব ঘরে বসবে? ওই চেয়ারটা টেনে নিযে এস বিছানার কাছে।

পণ্ডিত চেয়ারটি তাহাব বিছানার কাছে টানিযা লইযা গিযা বসিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তুমি ঠিকই ধরেছ পণ্ডিত। চোখ আমার লালই হয়েছে।

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরও কোনো সংশয় ছিল না। সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আজ দশ রাত্রি আমি ঘুমোই নি;—রাত্রেও না, দিনেও না। ঠায় জেগে কাটিয়েছি। কি করি বলো তো?

পণ্ডিত বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল,—তুমি বাড়ির কথা ভেবো না, বিশু। বাড়ির কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাবে। মনে কর, বাড়ি নেই,—এইটেই বাড়ি।

তাহাকে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলিল,—দুত্তোর বাড়ি! বাড়ির কথা ভাববার জন্যে আমার দায় পড়েছে। তুমি কিছু বোঝ না কেন?

পণ্ডিত বোঝে সবই, কিন্তু দীর্ঘকাল বড় লোকের সঙ্গে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার না বুঝিবার ভান করা তাহার এমন রপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, সে অভ্যাস আজও যায় নাই।

পণ্ডিতের একখানি হাত খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—আমি ঠিক ম'রে যাব পণ্ডিত,—ঠিক ম'রে যাব। দেখছ না, আমার শরীর দিন-দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে? আমার দেহে-মনে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে,—তারই যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছট্‌ফট্ করছি। এমন করলে ক'দিন বাঁচবো?

পণ্ডিত একবার তাহার দেহের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তারপর একটু কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল,—তোমাকে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই আমি এমনি অবস্থার কথা ভেবেছিলাম। তার আগে ঘোষকেও দেখলাম কি না। বেচারার তো মাথাই খারাপ হ'য়ে গেল।

পণ্ডিত হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িল।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—তোমায় ছুঁয়ে বলছি, জীবনে কোনো দিন আমার এ চঞ্চলতা আসেনি। অমলা যতদিন ছিল, তার দেহের পানে ফিরে তাকাবার

কোনোদিনই প্রয়োজন বোধ করিনি। লালসার কথা ভাবতে গেলেও আমার মন সংকুচিত হয়ে যেত। এ আমার কৃচ্ছ্রসাধন নয় পণ্ডিত, এই ছিল আমার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে রূপের চাইতে অরূপের 'পরেই লোভ ছিল বেশি। সেই অপরূপকে আমি পেয়েছিলাম অমলার মধ্যে। তাকেই পেয়ে আমার সমস্ত মন প্রজাপতির মতো দুখানি পাখা মেলেছিল। দু'হাতে আমার নিজেকে বিলিযেও শেষ করতে পারতাম না–তবু সবই বাকী থেকে যেত। কেউ কি জানতো, কিসের আনন্দে অমন ক'রে খাটতে পারতাম?

একটু থামিয়া বিশ্বেশ্বর আবার বলিল, আমার কেবলি কি মনে হোতো জানো পণ্ডিত? মনে হোতো, এই পৃথিবীর কাছে আমার অনেক ঋণ। অমলার হাত দিযে তার সমস্ত রস সে একা আমাকেই পরিবেশন ক'রেছে। সেই ঋণ আমায় শুধতেই হবে। এ কথা কি অমলাই জানতো? প্রথম যৌবনের লালসা তখন তার কাঁধে ভর ক'রেছে। সে চাইতো, মাটির তালের মতো তার দেহকে কেবল চটকাই। মাঝে-মাঝে তার চোখের পানে চাইলে আমার ভয় হোতো। সেই ভযেই আমি ক্রমাগত তাকে এড়িয়ে চলতে চাইতাম।

বিশ্বেশ্বর আপন মনেই একটু হাসিল।

—তখন কি জানি, এত প্রচণ্ড তার শক্তি! সেই লালসা অমলাকে মেরেছে, আমাকেও মারবে।

বিশ্বেশ্বর আবার হাসিল, –মুমূর্ষু রোগীর মতো অত্যন্ত ক্ষীণ, পাতলা হাসি।

অকস্মাৎ পণ্ডিতের জামার আস্তিনে টান দিযা বিশ্বেশ্বর বলিল,—কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, পণ্ডিত, আমার জীবনে যার দেহের কোনোই প্রয়োজন বোধ করিনি, তার সেই দেহটাই যেদিন ছাই হ'য়ে গেল, সেদিন যেন আমার জীবনেরও আর কোনো মানে রইল না! তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, কিন্তু সত্যিই আমি খুনের দায় থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাই

করিনি। অথচ, বাঁচবার পথ নিশ্চয় ছিল। আমার মনে হোল, এবারে এই দেহটা ফাঁসীতেই শেষ হোক, আর জেলেই শেষ হোক, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চঞ্চল হওয়ার কারণ নেই। আর আজকে এই দেহটা নিয়েই—

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের পানে চাহিল।

পণ্ডিত চিন্তিত ভাবে বলিল,—তাইতো!

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা পণ্ডিত তোমার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

—আছেন বই কি! নইলে কার জন্যে আর টাকা আত্মসাৎ করলাম?

—তা বটে।—তারপরে একটু দ্বিধা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বেশ সুন্দরী?

পণ্ডিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—খুব।

—তা ছাড়াও তো...

—হ্যাঁ, তা ছাড়াও অনেক ছিল।

বিশ্বেশ্বর বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, বেশ, বেশ। পণ্ডিত, তুমি খুব সুখী লোক। তোমাকে আমার হিংসে হয়। তোমার কাছে সেই সব গল্প শুনতে খুব ইচ্ছে হয়। বলবে একদিন? আমি নিজে অনেক সময় সেই সব ঘটনা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। পারিনে। তুমি বেশ রসিক লোক,—অভিজ্ঞতাও অনেক। তোমার কাছেই শুনবো একদিন।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—তাই শুনো। তারপর অবসর সময়ে ব'সে ব'সে তারই সাহায্যে নতুন নতুন কল্পনা কোরো। তোমার এই সব গল্প শুনতে বেশ লাগে, না?

স্বীকার করিতে বিশ্বেশ্বরের লজ্জা কবিতেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের কাছে আবার লজ্জা কি? সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বেশ লাগে।

[১০]

এই একটা মাস ঘোষের যেন আর কাটিতেছিল না। সে নিখুঁৎ হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, ২১শে সেপ্টেম্বর তাহার মুক্তির দিন। তার দুই একদিন আগেও ছাড়িয়া দিতে পারে। জেলের বহিতে তাহার সম্বন্ধে মন্দ মন্তব্য কিছুই নাই। কেবল একবার জেলারের বিরুদ্ধে চটিয়া গিয়া তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিল। তাহাতে তাহার 'পেনাল ডায়েড' হইত। কিন্তু জেলার লোক ভালো, পাঁচ জনে এবং তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষ নিজেও গিয়া তাহার হাতে-পায়ে ধরায় সে যাত্রা নিষ্কৃতি পায়। সুতরাং এক মাসেই যে সে ছাড়া পাইবে সে বিষয়ে কোনোই ভুল নাই, বরং আটাশ দিনও হইতে পারে, সাতাশ দিনও হইতে পারে।

মুক্তির সম্ভাবনায় ঘোষের আনন্দ হইয়াছে নিশ্চয়ই। তথাপি, কেন জানি না, সে অবসর সময়ে সম্পূর্ণ একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালোবাসে। কেহ আসিয়া টানিয়া বাহির না করিলে বড় একটা বাহিরে আসে না। বেশির ভাগ সময় সে হয় গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া ভাবে, নয় গুণ-গুণ স্বরে গান গাহিয়া ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পাদচারণা করে। সে যেন আস্তে-আস্তে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে কাহারও সংবাদ রাখে না, তাহার সংবাদও বড় একটা কেহ রাখে না।

তাহার মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন একদিন পণ্ডিত আসিয়া তাহার কক্ষে দেখা দিল।

পণ্ডিত তাহার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কী ঘোষ! দিন আর কাটছে না, না?

ঘোষ সম্ভবত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সে প্রথমটা অবাক হইয়া

পণ্ডিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল এবং তারপর বলিল,—খবর কি পণ্ডিত?

পণ্ডিত তাহার পাশে আর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল,—বাইরে গিয়ে তোমাকে একবার শ্যামবাজার যেতে হবে।

ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল,—শ্যামবাজার?

পণ্ডিত তাহার বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল,—চিঠিই দিতাম, কিন্তু তুমি যে লোক, চিঠি নিয়ে যাওযা তোমার কাজ নয়। যাওয়ার সময় গেটে ঝাড়া-পো'ড়া নিয়ে তবে ছাড়বে। তুমি চিঠি সামলে নিয়ে যেতে পারবে না, ধরা পড়ে আবার জেল খাটবে। সে হয় না। কিন্তু আমারও ভারি জরুরী প্রযোজন। কাল রাত্রে সেই কথাই শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। কি ক'রে যে খবর দিই, তার দিশে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হোল, তোমাকে দিয়ে খবর পাঠালেই তো চলবে।

ঘোষের এতক্ষণে মনে পড়িল, শ্যামবাজারে পণ্ডিতদের বাড়ি। সে জিজ্ঞাসা করিল,—কাজটি কি?

পণ্ডিত বলিল,—সে যাবার সময় ব'লে দোব এখন। এই যে, বিশু! কি মনে করে?

বিশ্বেশ্বর উত্তরে শুধু একটু হাসিয অন্য স্থানের অভাবে ঘোষের বিছানার উপরই পা ঝুলাইয়া বসিল।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—একা-একা অনাথিনীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো,—তোমার মিরাণ্ডা কোথায?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—সে শালা মরেছে। কালকে সন্ধ্যার সময় সিগারেটের দরকার পড়েছিল, একবার এসে নিয়ে গেল। তারপর আর তার খোঁজ নেই। সে থাক্। কিন্তু ঘোষ যে চল্‌ল। আমার সত্যি এখন থেকেই মনটা খারাপ করছে।

পণ্ডিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমারও। কিন্তু—আচ্ছা ঘোষ, তুমি এখন গিয়ে কোথায় উঠবে?

ঘোষ মুক্তির সম্বন্ধে ক্রমাগত অনেক কিছু ভাবিয়াছে,—এই কথাটি ছাড়া। তাহার পায়ের নিচের মাটি যেন সরিয়া গেল। সে হতাশ ভাবে বলিল,—তাই তো!

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও নেই?

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এক পয়সাও না। যা ছিল, তাও.. হুঃ।

পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিল,—বন্ধু-বান্ধব?

ঘোষ উত্তর দিবার প্রয়োজন মনে করিল না,--শুধু একটু হাসিল। চোরের কি ভদ্রলোক বন্ধু-বান্ধব থাকে? লোকে তাহাকে আশ্রয় দিবে কোন সাহসে?

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, সেই যে মেয়েটি,—কি যেন চমৎকার একটি নাম আছে তার, ভুলে যাচ্ছি,- যে মেয়েটি তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিল, দিন কয়েকের জন্যে সে কি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে না? এতদিনে হয় তো তার ছোট সংসারটি ছেলে মেয়েতে আরও একটু বড় হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে মাতৃত্বের স্নিগ্ধতা এসেছে। সে আরো অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে নিশ্চয়। পুরোণো প্রেম স্মরণ ক'রেও সে কি তোমায় একটু আশ্রয় দেবে না?

ঘোষ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,- দেবে? তুমি কি মনে কর পণ্ডিত, দেবে না? অথচ তারই জন্যে আজকে আমার এই অবস্থা। নইলে মক্কেলের টাকা ভাঙার আমার কি-ই বা প্রয়োজন ছিল?

পণ্ডিত বলিল, দেখ ঘোষ, পুরোণো প্রেমের দাম ছেঁড়া জুতোর চেয়েও কম। ছেঁড়া জুতোও মেরামত ক'রে সময় অসময়ে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু পুরোণো প্রেমের আর মেরামতও চলে না। তবে-

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, -তুমি বলো কি পণ্ডিত? কোনো গাছের ছায়ায় যে-অপরাহ্নটি ওরা দু'জনে মিলে কাটিয়েছে, যে-বাদলের মধ্যাহ্নে একের মন অন্যের সঙ্গের জন্যে লোভার্ত হ'য়ে উঠেছে হোলেই বা সে একটি মাত্র অপরাহ্ন, হোলেই বা সে স্বল্প ক'টি দিন মানুষের জীবনে তার কি কোনো মূল্য নেই?

পণ্ডিত চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কিছুমাত্র না। সে অপরাহ্ণটিকে ওরা মূল্য দিয়েই কিনেছিল। কিন্তু আজকে সেই পুরোণো অপরাহ্ণটির কোনো মূল্যই নেই। মানুষ প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। আজকে ঘোষকে আবার নতুন অপরাহ্নের সন্ধানে বেরুতে হবে,—নতুন একটা বাদলের মধ্যাহ্নের।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল,—তুমি জানো না পণ্ডিত, প্রেমের ব্যাপারে তুমি একটা প্রকাণ্ড নাস্তিক। তোমার ধারণা নেই, স্মৃতির টান কত প্রচণ্ড। যে-বাড়িটায় তিন দিনের জন্যে বাসা বেঁধেও মানুষ চলে আসে পথ চলতে হঠাৎ সেই বাড়িটির সামনে এসে পড়লে সহস্র কাজের কথা ভুলেও মানুষ সেই বাড়ির পানে চায়। পুরোণো বাসার প্রত্যেকটি পরমাণু তাকে টানে। আর মানুষ, যার সঙ্গে কত মধুর মুহূর্তের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সে টানবে না?

পণ্ডিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,—তুমি যা বলবে, আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনো মেয়েকেই কোনো একটা পুরুষ চিরকালের জন্যে জয় করতে পারে না, যদি না মন্ত্র পড়ে, আইন দিয়ে তার ভালোবাসার অগ্রগতিকে বাধা দেয়। সে সুযোগ যারা পায় না, তারা একটি মেয়ের একটি মুহূর্তকেই জয় করে। গাছের জীবনে যে ফুলটি কালকে ফুটে কালকেই শুকিয়ে গেছে, আজ নতুন ফুল ফুটলো ব'লেই গতকালের ফুলটিও তো মিথ্যে নয়!—গাছের কাছেও নয়, ঝরা ফুলটির কাছেও নয়।

পণ্ডিত একটু হাসিয়া বলিল,—তুমি যখন কবিতার মতো ক'রে কথা বলো বিশু, আমার ভারি মিষ্টি লাগে। তোমার কথাতেই সায় দিতে লোভ হয়। কিন্তু আমি জানি তোমার কথা সত্যি নয়। খুব ছেলে বেলায় একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম। সেই মেয়ের যে দিন অন্য জায়গায় বিয়ে হোল, সেদিন আমি কেবলই কেঁদেছিলাম। সেও কম কাঁদেনি। তারপরে কখন যে তাকে ভুলে গেলাম টেরও পেলাম না। অনেক দিন পরে হঠাৎ

একখানা চিঠি এলো তার স্বামী মারা গেছেন। ক'টি নাবালক ছেলে নিয়ে সে অকূলে ভাসছে, কিছু সাহায্য চাই। প'ড়ে কষ্ট হোলো, গোটা কয়েক টাকা পাঠাবারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দিচ্ছি-দোব ক'রে তাও পাঠাতে ভুলে গেলাম।

ঘোষ ইংরাজিতে বলিল,—Brute.

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—তা বলো। এবং তোমার 'পুরোণো প্রেম'ও যেদিন তোমাকে আশ্রয় দেবে না, সেদিন তাকেও এই গালাগালিটা দিয়ে এসো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।

ঘোষ ও বিশ্বেশ্বর রাগিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিযা পণ্ডিত শয়তানের মতো ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল,—মিথ্যে তোমাদেব ক্রোধের ভাজন হ'লাম। যখন হ'লাম তখন আরও একটু ব'লে যাই। মেয়েরা কোনো দিন কোনো পুরুষকেই ভালোবাসে না। মা হওযাব যে আনন্দ, ওরা ভালোবাসে সেই আনন্দকে। পুরুষ সেই আনন্দের উপলক্ষ মাত্র। তারা চিরকাল বোকা, তাই চিরদিন দাস,—মৌমাছির মতো খেটে মবে। তাদেব চরিত্রহীন ব'লে বদনাম আছে, কিন্তু সে শুধু একটা যোয়াল খুলে আর একটা যোয়াল ঘাড়ে নেওয়াব জন্যে।

পণ্ডিত আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর অস্ফুট স্বরে বলিল,—নাস্তিক।

মনের মধ্যে কোথায় যে ফাঁক, খুঁজিয়া না পাইয়া বিশ্বেশ্বর বিধাতার উপবং চটে, নিজের উপব চটে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর চটে। তাহার সমস্ত জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্য যদি বিধাতা থাকেন, তবে এমন করিযা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠানোর কি-ই বা প্রয়োজন ছিল!

বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলে,—ভগবান নেই।

তবু;—মানুষের যে একজন ভগবান চাই-ই। এই দুঃখ যে শুধু দুঃখ নয়, ইহা যে অজানিত বৃহত্তর কোনো কল্যাণের জন্য ভগবানের স্বহস্তের দান এবং ইহার পরে যে একটি অবিচ্ছিন্ন সুখের সম্ভাবনা আছে, তাহা না ভাবিলে দুঃখী মানুষ বাঁচে না। দুঃখের ভারে মানুষের মেরুদণ্ড যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন এই সম্ভাবনার কথা ভাবিয়াই সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় কোনোরূপে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস পায়।

বিশ্বেশ্বরের মন দ্বিধাভবে টলে।—

এমনি করিয়া তাহার দিন রাত্রি কাটে' নারীর প্রেম, নারীর অধর-কোণের হাসি এবং নয়নকোণের দৃষ্টি, তাহার মৃণাল বাহুর আলিঙ্গন কল্পনা করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন মাধুর্যরসে আপ্লুত হইয়া ওঠে সে যুক্তকরে ভগবানকে প্রণতি জানায়। তারপরে আসে প্রতিক্রিয়া।

জীবনের ব্যর্থতা ও পুরুষ-জীবনের নিরুদ্ধ কামনা অকস্মাৎ অগ্নি উদ্গার করে। সে অস্থির হইয়া ঘরময় পায়চারী করে এবং টেবিলে একটা ঘুসি মারিয়া বলে—ভগবান নেই।

পণ্ডিতের কথা তার ভালো লাগে নাই। এমনি কথা শুনিলেই তার মন মাতালের মতো অস্থির হইয়া ওঠে। এবং এই ধরণের যুক্তি যতই তার মনের মধ্যে দাগ কাটিতে চেষ্টা করে, ততই সে অধৈর্য হয়, কিছুতে সহ্য করিতে পারে না।

ঘোষের ঘর হইতে আসিয়া সে মনে মনে অমলার কথা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অমলার সম্বন্ধে ভাবিবার কিছুই নাই। সে প্রেম প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বৃহৎ—টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিয়া দেখা চলে না। তাজমহল যেমন একখানি-একখানি পাথর চুনিয়া এক একটি দিনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এ তেমন নয়। ইহার পরিপূর্ণতা আছে, সমগ্র একটি রূপ আছে, পিছনে কোনো পট-ভূমিকাই নাই। হঠাৎ একদিন অমলাকে সে পাইয়াছিল, হঠাৎই ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এই ভালোবাসা

এতই বৃহৎ এবং এতই সহজ যে, প্রেম-নিবেদনেরও প্রয়োজন হয় নাই, নিত্য নূতন-নূতন ঘটনা-সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু ঘোষের তো তেমন নয়। আপনার সমস্ত চিত্তকে বহু নারীর মধ্যে বিশেষ একটি নারীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিতে হইয়াছে, অল্পে অল্পে তাহার চিত্তকে জয় করিতে হইয়াছে। ইহা তো আকস্মিক নয়। দিনের পর দিন কত উদ্যম, কত কল্পনা ব্যয়িত হইয়াছে তাহার কি হিসাব আছে? হয়তো.

কিন্তু কল্পনা-প্রয়োগের আর প্রয়োজন হইল না, ঘোষ ধীরে ধীরে আসিয়া সর্বস্বহারার মতো করুণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

তাহার চেহারা দেখিয়া বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেক কিছু না হারাইলে মানুষের চেহারা অমন হয় না। অথচ আজ নূতন করিয়া কি-ই বা সে হারাইল!

তাহার কারাদণ্ডের কিছুদিনের মধ্যেই শাশ্বতী যখন নূতন একজনকে বিবাহ করিল, তখন সে ক্রোধে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে এবং কিছুটা অপমানেও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে ক্রোধ ভুলিতে দীর্ঘদিন লাগে নাই। এমনও মনে হইয়াছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতীও তাহার স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল বা। কারাবসানে সে যে শাশ্বতীর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে এ সম্ভাবনার কথাও ইতিপূর্বে তাহার মনে জাগে নাই। কিন্তু কথাটা যেই উঠিল, অমনি মনে হইল শাশ্বতীই যদি তাহাকে আশ্রয় না দিতে পারে তাহা হইলে কারামুক্তির আনন্দ আর রহিল কি! বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্নভাবে তাহার একখানি হাত ধরিতেই তাহার শীর্ণ ঘাড়ের উপর মাথাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে থপ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কি হয়েছে, ঘোষ?

ঘোষ প্রথমটা উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মাথাটা আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। একটু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—আচ্ছা, একি সত্যি?—পণ্ডিত যা বললে?

বিশ্বেশ্বর ক্ষিপ্রভাবে উত্তর দিল,--কক্ষনো না।

ঘোষ অলসভাবে বলিল,—কিন্তু আমি যেন কিছুতে মনেব মধ্যে জোর পাচ্ছিনে। তার সঙ্গে পরিচযেব মাস তিনেক পবে একদিন তাদের পরিবারেব সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তাকে সেদিন বলবাব যে আমাব অনেক কথা ছিল, আমার চোখ দেখে সে বোধ হয তা টেব পেযেছিল। এবং তারও বোধ হয় অনেক কথা বলবার ছিল। অন্য সকলের থেকে আমবা দুজন যে কখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি তা জানতেও পাবিনি। যখন জানতে পারলাম, তখন আমরা একটি নির্জন কুঞ্জের কাছে এসে পড়েছি। তখন সূর্য অস্ত যেতে বেশি দেবী নেই।

একটু থামিয়া ঘোষ বলিল,—আমবা নিঃশব্দে একটি বেঞ্চেব ওপব কতক্ষণ ব'সে রইলাম,--অনেকক্ষণ। কিন্তু যা বলতে চাই তা আব কিছুতে বলতে পারিনে। শুধু কখন এক সময তাব যে হাতটি টেনে নিযেছিলাম, সেই হাতখানি হাতের মধ্যে ক'বে ব'সেই আছি। অবশেষে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। তার পায়ের তলায় ব'সে তার কোলেব ওপর মাথাটি রেখে কি যে বললাম, তা আমার নিজের কানেই পেঁাছুল না; কিন্তু সে ঠিক শুনতে পেল। আমার মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে অস্ফুট স্বরে বললে,—আমি তোমারই। আর কারো নই—বলিযা ঘোষ নিজের মাথায় একবার হাত বুলাইল।

ঘোষের মাথায় প্রকাণ্ড টাক। বিশ্বেশ্বর অজ্ঞাতসারেই সেদিকে চাহিল। কিন্তু ঘোষের চোখ তখন ছলছল করিতেছিল।

ঘোষ বলিল,—সেই ক'টি কথার আনন্দ আমি কোনো দিন ভুলবো না। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি সে তো রাখেনি।

--কিন্তু কে বললে তোমায় রাখেনি?

ঘোষ বিস্মিতভাবে বলিল,—তার মানে? তুমি কি শোনোনি সে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে?

বিশ্বেশ্বর পরম দার্শনিকের মতো হাসিয়া বলিল, শুনেছি। কিন্তু কি জানো ঘোষ, যে-মেয়েটিকে তুমি ভালোবেসেছিলে সে তোমারই সৃষ্টি। তার মাধুর্যকে তুমি তোমার অন্তরের নিজস্ব রূপ দিয়েছিলে। যে-মেয়েটি অন্য একজনকে বিয়ে করেছে সে তোমার শাশ্বতী নয়। তোমার শাশ্বতী তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে আজও তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

কথাটা না বুঝিয়া ঘোষ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এমন সময় মিরাণ্ডা আসিয়া বিশ্বেশ্বরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বেশ্বরের মন যখন রূপলোকে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন মিরাণ্ডাকে দেখিলেই তাহার সমস্ত অঙ্গ ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া ওঠে। সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল।

ঘরে আসিয়া বিশ্বেশ্বর নিজের চেয়ারটিতে বসিয়া বলিল,—বুঝতে পারলে? আজও তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

কিন্তু ঘোষের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল, সে ইহার একটি বর্ণও বোঝে নাই।

বিশ্বেশ্বরও কিন্তু আর বোঝাইবার চেষ্টা করিল না। অন্যমনস্কভাবে পা নড়াইতে নড়াইতে সে হঠাৎ উঠিয়া বালিশের তলা হইতে গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিরাণ্ডা তখন বারান্দার এক প্রান্তে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছিল। বিশ্বেশ্বর তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন করুণা হইতেছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে তাহার হাতে একটা সিগারেট গুঁজিয়া দিল। মিরাণ্ডার ক্রোধ তখন আর বাধা মানিল না। সে সিগারেটটা কুটি-কুটি করিয়া

ছিঁড়িয়া নিচে ফেলিয়া দিয়াই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না আর থামিতে চায় না।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন অনুশোচনা হইয়াছে। ছেলেমানুষ,--অমন করিয়া উহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহিব করিয়া না দিলেও চলিত। সে তো কিছু করে নাই, গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র।

সে তাহাকে নিচে লইয়া গিয়া উঠানে পায়চাবি করিতে করিতে অনেক কথা বলিল। তবে তাহার রাগ ভাঙ্গিল।

—জানো মিরাণ্ডা, আজ বিকেলে আমার মা আসবেন, দেখা করতে। দশটা টাকা তিনি নিয়ে আসবেন। তার মধ্যে পাঁচটা টাকা তোমায় দোব। তুমি যা খুসী কিনো।

মিরাণ্ডার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল,—সত্যি দেবে?

—সত্যি দোব। কি কিনবে বলো তো?

--সে বলবো না। একটা মজার জিনিস কেনার ভারি দরকার ছিল। বেশ হোলো।—বলিয়া কি মজার জিনিস কেনা যায় তাহাই ভাবিতে-ভাবিতে মিরাণ্ডা খুসী হইয়া উঠিল।

দুপুর বেলার মধ্যে মিরাণ্ডা কথায়-কথায় বার দুই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছে, বিশ্বেশ্বরের মা ঠিক আসিবেন তো? তাহার ব্যাকুলতার কারণ ভাবিয়া বিশ্বেশ্বর না হাসিয়া পারে নাই।

পাঁচটার সময় জেল-আফিস হইতে লোক আসিয়া পেঁাছিতে না পেঁাছিতে সে নিচে হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে সংবাদ দিল, তাহার মা আসিয়াছেন। জেল আফিসের লোকও তখনই পেঁাছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে দেরি হইল না।

আনন্দময়ীর শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে কঠিন অসুখে পড়িয়া প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু পাছে বিশ্বেশ্বর উদ্বিগ্ন

হইয়া ওঠে, সেজন্য সংবাদটি বরাবর গোপন রাখা হইয়াছিল। গেল বারে গুণেন্দ্র একাই আসিয়া দেখা করিয়া টাকা দিয়া গিয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে আনন্দময়ী আসিতে পারিলেন না, এই কথাই বিশ্বেশ্বরকে জানানো হইয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,- তোমার কি অসুখ ক'রেছিল মা? শরীর যে বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে।

আনন্দময়ী উত্তর দিলেন না। তিনি বিশ্বেশ্বরের দেহের পানে চাহিয়া আশংকায় ও উদ্বেগে শিহরিয়া উঠিলেন, চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

তিনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর এ কি চেহারা হ'য়েছে বিশু! গাল ভেঙ্গে গেছে, সর্বাঙ্গের চামড়ায় কর্কশতা এসেছে চোখের কোণে কালি প'ড়েছে,- তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

বিশ্বেশ্বর কৃত্রিম উৎসাহের সহিত বলিল,—না, কষ্ট আর কি! জেলে টাকা না থাকলেই কষ্ট। টাকা থাকলে যা চাইবে তাই হাতের কাছে পাবে। সেই জন্যই তো বারে বারে টাকা চেয়ে তোমাদের বিরক্ত করি।

কিন্তু মায়ের চোখে কৃত্রিমতা ঢাকা পড়ে না। তাঁহার উদ্বেগ গেল না।

গুণেন্দ্রর পেটের মধ্যে অনেকগুলা কথা জমিয়া গজ্‌গজ্‌ করিতেছিল। কাহারও দেহ সম্বন্ধে আলোচনায় তাহার কোন দিনই উৎসাহ নাই। তাহার ধারণা, অসুখ হইলেই মানুষের শরীর খারাপ হয়, এবং অসুখ সারিয়া গেলেই শরীরও সারিয়া যায়। ইহার জন্য চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাহারও ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। বিশ্বেশ্বর এবং আনন্দময়ী একটু চুপ করিতেই সে সেই অবসরে বলিল,-

—আমাদের কত বই হ'য়েছে, শুনেছ বিশুদা? এগারো শো'র বেশি। তারিণী চৌধুরীর মত লোকও একশো টাকা দিয়েছে। বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় একশোটি মেয়ে পড়ছে। জেঠাইমার পাল্লায় প'ড়ে গ্রামে এমন একটি মেয়ে নেই, যে নারীমঙ্গল-সমিতির সভ্য নয়।—

বিশ্বেশ্বর সোল্লাসে বলিল,—তাই নাকি! তারিণী চৌধুরীও।—বলো কি হে?

গুণেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—দিয়েছে কি সাধে? সেবার বাবা এসে এমনি কড়্‌কে দিয়ে গেলেন যে, বেচারি ভয়ে ভয়ে একশো টাকা দিয়ে গেল।

—তোমরা খুব বাহাদুর তো' বলিয়া বিশ্বেশ্বর পিছনে চাহিয়া দেখিয়া লইল ডেপুটি জেলার কি করিতেছে।

—এইবার বিশুদা, নির্ঘাৎ একটি ব্রহ্মচর্য-আশ্রম খুলতে হবে।

বিশ্বেশ্বর একটু অন্যমনস্ক হইতেছিল। গুণেন্দ্রের কথা ঠিক শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুলতে হবে?

—ব্রহ্মচর্য-আশ্রম।

ঠিক সেই সময়েই ডেপুটি জেলার তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া থুথু ফেলিতে উঠিল।

বিশ্বেশ্বর এই সুযোগে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,- টাকা এনেছ?

এবং কাহার কাছে টাকাটা আছে জানিতে না পারায় চকিতের মধ্যে একবার মায়ের পানে, একবার গুণেন্দ্রের পানে চাহিল। গুণেন্দ্রের কাছেই টাকাটা ছিল। সে বাহির করিয়া দিতেই বিশ্বেশ্বর চট্ করিয়া তাহা পেন্টুলুনের পকেটে পুরিয়া ফেলিয়া যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে বলিল,—

হ্যাঁ ব্রহ্মচর্য-আশ্রমটা নিতান্তই চাই। ব্রহ্মচর্যের অভাবই জাতির বর্তমান অধোগতির কারণ। মনের স্থৈর্য, ধৈর্য, বীর্য সব যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, শুধু এই একটা জিনিস ভুলেছি ব'লেই। আমার মনে হচ্ছে, এ সম্বন্ধে আমি একটা লিখিত স্কীমও করেছিলাম। মণ্ডলীর আফিসে খুঁজলে পেতেও পারো।

গুণেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল,—সেইটে হঠাৎ একদিন পাওয়ার পরেই তো এ সংকল্প আমাদের মাথায় এসেছে। সেদিন মণ্ডলীর বার্ষিক উৎসবে

বাবা নিজে সভাপতি হ'য়েছিলেন। তোমার উল্লেখ ক'রে তিনি আমাদের বললেন, তোমার স্মৃতির সব চেয়ে বড় সম্মান তোমার ছবি পুজো ক'রে নয়। তুমি ফিরে এসে যেদিন দেখবে তোমার প্রত্যেকটি সংকল্পকে আমরা রূপ দিতে পেরেছি সে দিনই তোমাকে আমরা সত্যিকার সম্মান দোব। আমি তখনি তাঁকে তোমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমের স্কীমটি দেখালাম। সেটি প'ড়ে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ত'বই পিঠে দু'শো টাকা চাঁদা সই ক'রে দিলেন এবং বললেন, আরও টাকা তিনি উঠিয়ে দেবেন।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—আপাতত, একটি মাইনর স্কুল নিয়েই আরম্ভ কর। পরে আস্তে আস্তে হাই স্কুল করলেই চলবে। প্রথমেই যদি বড় ক'রে আরম্ভ কর, সামলাতে পারবে না।

গুণেন্দ্র বলিল,—না, এখন তো হাই স্কুল নয়। সে হবে তুমি ফিরে গেলে। তুমি হবে হেড মাস্টার, আমি সেকেন্ড মাস্টার।

গুণেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি সেকেন্ড মাস্টার হবে কি? তুমি তো ততদিন নিশ্চয়ই একটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পেয়ে যাবে।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল,--হয়তো পাবো। অন্তত বাবা সেই চেষ্টাই করছেন। কিন্তু আমি স্থির ক'রেছি গ্রামের কাজেই জীবন উৎসর্গ করবো। তোমার যা ব্রত, আমারও সেই ব্রত।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমার কি ব্রত জানো?

গুণেন্দ্রও হাসিয়া উত্তর দিল,—সব হয় তো জানি নে। কিন্তু যেটুকু জেনেছি - আমার মতো লোকের সমস্ত জীবনের পক্ষে তাই ঢের।

উত্তর শুনিয়া বিশ্বেশ্বরও হাসিল,- কিন্তু অত্যন্ত ফিকা, পাংলা হাসি।

গুণেন্দ্রের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটি জেলার আসিয়া বলিল, সময় হইয়া গিয়াছে।

সকলকে উঠিতে হইল।

এতক্ষণে গুণেন্দ্রের আনন্দময়ীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—ওই যাঃ! জ্যাঠাইমা, তুমি তো এতক্ষণ একটা কথাও বল নি।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস আনন্দময়ীর অন্তস্তল হইতে অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। তিনি চলিতে চলিতে বলিলেন, -সব কথাই তো তুই বললি। আমার আর নতুন কি-ইবা বলার ছিল!

একটু থামিয়া, পিছন ফিরিয়া বিশ্বেশ্বরকে বলিলেন, -খুব সাবধানে থাকিস, বিশু।

আনন্দময়ীর নূতন কিছুই বলিবার ছিল না।

সংসারে তাঁহার বন্ধন বলিতে ওই একটি। ওইটিকে রাখিয়া স্বামী যেদিন পরলোক গমন করেন, সেদিন তিনি শেষ অনুরোধ করিয়া যান,-বিশুকে মানুষ করিও। আনন্দময়ীকে ভাঙ্গা মন আবার নূতন করিয়া বাঁধিতে হইল। বাঁচিবার আনন্দ যাঁহার শেষ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রাণ-ধারণের বিড়ম্বনা বড় কম নয়। কিন্তু চোখের জল চোখেই শুকাইয়া আনন্দময়ীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল;—বিশুকে মানুষ করিতে হইবে যে, বিশুকে সর্বপ্রকারে তাহার পিতার অনুরূপ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার স্বামীর শেষ আদেশ।

সহজ স্বচ্ছন্দতায় বিশ্বেশ্বর বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সে কি জানিত, তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্তের গতিবিধি তাহার ওই শুচিস্মিতা জননী সকলের অলক্ষ্যে নিয়ত লক্ষ্য করিতেছেন? -সকলের কাছে অতি সহজে যাহা গোপন করিয়া চলে, মায়ের কাছে তাহার কিছুই গোপন থাকে না?

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! যাঁহাকে ছাড়িয়া একদিনও কি করিয়া বাঁচা যায় ভাবিতে আনন্দময়ী শিহরিয়া উঠিতেন, একদিন তাঁহারই চেয়ে তাঁহারই গচ্ছিত দ্রব্য মহার্ঘ হইয়া উঠিল। স্বামীর কথা আনন্দময়ীর আর মনেও পড়িত না। তাঁহার সকল চিন্তা, সমস্ত কর্ম শুধু বিশ্বেশ্বরের পিছনেই

নিয়োজিত হইল—তাহাকে মানুষ করিতে হইবে। সেই বিশ্বেশ্বর একদিন বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রে মানুষ হইল,—সন্তানের গর্বে মায়ের বুক ভরিয়া উঠিল।

বহুকাল পরে সেই স্বামীকে স্মরণ করিয়া আজ কিন্তু আনন্দময়ীর মন হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কেবলি বলিতে লাগিল, মানুষের ছেলেকে মানুষ করা যে এত অসম্ভব এ তো তুমি জানিতে প্রভু' তবে এত বড় পণ্ডশ্রমের বোঝা কেন আমার উপর দিয়া গেলে। আমি যে তোমার আদেশের মোহে তোমাকেও ভুলিয়া বসিয়াছিলাম।

নূতন কথা? না নূতন কথা কিছুই তাঁহার বলিবার নাই—বিশুকেও না পৃথিবীর কোনো মানুষকেই না। রসাল ভাবিয়া যে তরুটিকে এত কাল তিনি সুপ্রচুর স্নেহবারিসেচনে বড় করিলেন আজ বুঝিলেন তাহা রসাল নয়। মায়ের জীবনে ইহার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর আছে? তাঁহার ভাঙ্গা মন শেষ বারের মতো ভাঙ্গিয়া গেল।

অথচ এমন কি ই বা তিনি বিশ্বেশ্বরের চেহারায় দেখিলেন জেলের অনিয়ম পরিশ্রম এবং অত্যাচার তো সহজ নয়। চিরকাল সুখে লালিত বিশ্বেশ্বরের তাহাতে চেহারা খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা। শরীর অসুস্থ বলিয়াই গাল ভাঙ্গিয়াছে হনু উঁচু হইয়াছে। দুর্বলতার জন্য চোখের কোণে কালি পড়িয়া দৃষ্টি কিছু উগ্র হইয়াছে। ত্বকের কর্কশতা' তৈলাভাবে অমন হয়।

কিন্তু আনন্দময়ীর মন বলিল না না না।

অফিস ঘর হইতে বাহির হইয়াই বিশ্বেশ্বর যেন ওয়ার্ডে ফিরিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে একবার বিদ্রূপের সুরে বলিল -ব্রহ্মচর্য আশ্রম! হুঁ

গণেন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার ভারি কৌতুক বোধ হইয়াছে। ছেলে-

মানুষ,—ভাবিয়াছে ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। সমস্ত মানুষ যেন ব্রহ্মচর্য পালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—কেবল গুণেন্দ্রের মুখের একটি কথার অপেক্ষা। এবং যে দিন সমস্ত মানুষ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিবে, সে দিন আর পৃথিবীতে কোনো দুঃখ থাকিবে না। বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবে, গাভী বহুক্ষীরা হইবে, সকল নারী সতী ও সকল পুরুষ সৎ হইবে, এবং পাপীকে জেল খাটাইবার জন্য পুণ্যবানের আদালতে নালিশ করার প্রয়োজন হইবে না।

বিশ্বেশ্বর মনে মনে খুব এক চোট হাসিযা লইল।

তাহাকে ওয়ার্ডে প্রবেশ কবিতে দেখিযাই মিবান্ডা ছুটিযা আসিযা তাহাব একখানি হাত চাপিষা ধবিযা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবিল,—তোমাব মা এসেছিলেন? খবর সব ভালো?

বিশ্বেশ্বব তাহাব মাথাটি নাড়িয়া দিয়া বলিল,—হ্যাঁ, খবর সব ভালো,—মানে দশ টাকা পাওয়া গেছে।

মিরান্ডা বেশি খুশি হইল। বলিল,—তোমার মা বেশ লোক। আমার মায়ের টাকা দেওয়ার নাম নেই,—এসে শুধু বাইব্‌লের উপদেশ দিয়ে যায়।

পরে রাগিয়া বলিল,—ডাইনী বুড়ী!

ঘরের মধ্যে আসিয়া বিশ্বেশ্বর পেণ্টুলুনের পকেট হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি টেবিলের উপর রাখিয়া বাকী পাঁচটি পকেটে পুরিল।

টাকা দেখিয়া মিরান্ডার চোখ চক্-চক্ করিয়া উঠিল। প্রভুর বিনানু-মতিতে সম্মুখের মাংসখণ্ড গ্রহণ করিতে না পাইযা কুকুর যেমন লেজ নাড়িতে থাকে, টাকা কয়টি তুলিযা লওয়া ঠিক হইবে কি না স্থির করিতে না পারিয়া, মিরান্ডার দেহও সেইরূপ অস্থির হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর যেমন বলিল,—ও টাকা তোমার, তুমি নিয়ে যাও,—মিরান্ডা ঠিক চিলের মত ছোঁ মারিয়া তাহা লইয়াই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, আর এক মুহূর্ত দাঁড়াইল না।

তাহার পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর আর একদফা হাসিল, -পৃথিবীর আর এক পিঠ।

এমন সময় চটি পায়ে ফট্-ফট্ করিয়া পণ্ডিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হোলো? দেশের খবর ভালো?

বিশ্বেশ্বর বলিল,—মায়ের শরীর খুব খারাপ দেখলাম। বোধ হয় অসুখ করেছিল, কিন্তু সে কথা লুকোলেন। ভাবলেন, আমি বোধ হয় ব্যস্ত হব।

পণ্ডিত বলিল,—ব্যস্ত হবারই তো কথা। তোমার তো ওই মা'টি ছাড়া আর কেউ নেই।

বিশ্বেশ্বর এ কথার জবাব দিল না, শুধু একটু হাসিল। তারপর বলিল,- আর একটি ছেলে এসেছিল, গুণেন। এবারে এম্-এ পাশ ক'রেছে। ওর বাবা ওর জন্যে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটগিরির চেষ্টা করছেন। ওর কিন্তু অন্য রকম ইচ্ছা।

পণ্ডিত বলিল,—কেন, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটি তো ভালো চাকরী।

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—ভালো চাকরীই তো। কিন্তু ও দেশোদ্ধার করতে চায়। আপাতত একটি ব্রহ্মচর্য-আশ্রম খুলবে স্থির করেছে।

পণ্ডিত বলিল,—সে তো ভালো কথা।

—ভালো কথা? তুমি বলো কি পণ্ডিত! ব্রহ্মচর্যের মানে আছে? যতদিন যৌবন জাগে না, ততদিন ব্রহ্মচর্য। একবার জাগলে আর রক্ষে আছে? এই শীতকালের দুপুর বেলায় দশ নম্বরের ছাদের উপর থেকে, কোনোদিন বা ওদিকের নেড়া অশ্বত্থ গাছের ডাল থেকে চিলের শীর্ণ তীক্ষ্ণ ডাক শুনতে পাও? ওর ডাকে আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলতে থাকে। আমি জানি ও ডাক আসে স্ত্রী চিলটির কণ্ঠ থেকে। ব্রহ্মচর্য! যেদিকেই চোখ মেল, দেখবে সমস্ত পৃথিবী দিবারাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন করছে। ব্রহ্ম-চর্যই বটে!

বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল,—বেশ তো। ব্রহ্মচর্য না পালতে চাও, নাই পাললে। কিন্তু চটছো কার ওপর?

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—না, চটি নি। আমি বলছিলাম. . এই যে ঘোষ! এসো, এসো।

ঘোষ একগাল হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা বিশ্বেশ্বর, তুমি কোনোদিন কবিতা লিখেছ?

ঘোষের মন যে খুবই প্রফুল্ল, তা তাহার মুখ দেখিযাই বোঝা যায়। নহিলে কয়েদীর কবিতা লিখিবার সখ হয়'

বিশ্বেশ্বর বলিল, -না। ও দুশ্চেষ্টা কোনোদিন করি নি, গোপনে গুণ গুণ করে বেতালা গান গাওয়াব বেশি আব এগুতে পাবি নি।

পণ্ডিত গম্ভীব ভাবে বলিল,—আমি লিখেছি।

ঘোষ এবং বিশ্বেশ্বর উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিযা উঠিল তুমি লিখেছ? কবিতা?

পণ্ডিত পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, -

—তাহোলে বলি শোন,—আমাব এক জ্যাঠামশাই ছিলেন। আমাদেব সংসাবে তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। আমবা একে একে ভূমিষ্ঠ হবামাত্রই তিনি ঠিক ক'বে ফেলতেন, আমাদেব কে কি হবে। বড়দা ভূমিষ্ঠ হবামাত্র জ্যাঠামশাই একটা জজিয়তি তাঁর জন্যে আলাদা ক'রে রেখে দিলেন,- কিন্তু তিনি পাঁচ বছব বযসেই মারা গেলেন। সম্ভবত সেইটিই পবে দ্বাবিক মিত্তিব পেয়েছিলেন। মেজদার এঞ্জিনিয়াব হওযাব কথা। তিনি জ্যাঠা-মহাশযেব কিছু মর্যাদা রেখেও ছিলেন,—অনেক কষ্টে সাব-ওভাবসিযার হ'লেন।

এইবার আমার পালা। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে-বাইরে ক্রমাগত শুনতে লাগলাম, আমি যে একটা মহামহোপাধ্যায় হ'যে পিতামহেব মর্যাদা রাখবো এ একরকম ঠিকই হ'যে আছে। কিন্তু ক্রমাগত পাঁচবার চেষ্টা

ক'রেও যখন কাব্যের উপাধিটি আয়ত্ত করতে পারলাম না, তখন জ্যাঠামশাই হতাশ হ'য়ে পড়লেন।

পঞ্চম বারের কাব্যের উপাধি পরীক্ষা ফল বেরবার পরদিন আমাকে বাইরের ঘরে ডেকে বললেন,—দেখ বাপু, আর তুমি কাব্যের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না।

এ বিষয়ে আমার নিজেরও কোনো সংশয় ছিল না। সবিনয়ে স্বীকার করলাম,—আজ্ঞে, না।

তিনি প্রশ্ন করলেন,—তা'হোলে কি করবে স্থির করলে? বেটাছেলে একটা কিছু করা তো চাই।

কিছুই স্থির করি নি। সুতরাং চুপ ক'রেই রইলাম।

তিনি পুনশ্চ বললেন,—দেখ বাপু, ও সংস্কৃতের দিকে আর তোমার কিছু হবে না। তুমি বরং বাংলার চর্চা করো।

আমি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি বললেন—আমাদের দ্বিজু ঠাকুরের ভাই, শুনলাম, বেশ কবিতা লিখছে। বিক্রিও কিছু কিছু হয়, দু'পয়সা হাতেও আসে।

বিশ্বেশ্বর বিস্মিত ভাবে বলিল,- দ্বিজু ঠাকুরের ভাইটি কে?

—রবীন্দ্রনাথ।—বলিয়া পণ্ডিত অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে তাহাদের মুখের পানে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ঘোষ ও বিশ্বেশ্বর হাসিয়া অস্থির হইল।

ঘোষ বলিল,—তার পরদিন থেকে তুমি কবিতা লিখতে লাগলে?

—প্রত্যহ। সকালে উঠে খাতা পেন্সিল নিয়ে জ্যাঠামহাশয়ের কাছে বসতে হোতো, দশটার সময় ছুটি পেতাম।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে পণ্ডিত অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল এবং একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—কিন্তু এমন স্নেহ-পরায়ণ মানুষ আর দু'টি দেখি নি। এ পৃথিবীতে তিনি একটি ব্যতিক্রম।

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ উল্লাসভরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল,—দেখলে, ঘোষ, পণ্ডিতেরও দুর্বলতা আছে।

[১১]

ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় কাণ্ড হইয়া গেল,—যাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না।—

জেলে "সরকার সালাম" বলিয়া একটা বস্তু আছে। সকালে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন কয়েদী-পরিদর্শনে বাহির হন, তখন প্রত্যেক ওযার্ডে কয়েদীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইযা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে। সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেই কোন সিপাহী হাঁকে,—সরকার—

কয়েদীবা কপালে হাত ঠেকাইযা সমস্ববে বলে,—সালাম!

ওদিকের রাজনীতিক ওযার্ডেব বন্দিগণ জেদ ধবিযা বসিলেন, তাঁহাবা "সরকার সালাম" করিবেন না, তাঁহারা ছাপাখানায কাজও কবিবেন না। তাঁহাদের জেদ যত বাড়িয়া চলিল, তাঁহাদের উপব জুলুমও তত বাড়িতে লাগিল। শেষটা তাঁহারা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন।

পাঁচদিন, সাতদিন, দিশদিন যায়।—জেল-কর্তৃপক্ষও জেদ ছাড়েন না, রাজবন্দিগণও জেদ ছাড়েন না। বিশ্বেশ্বরেরা তাহাদের ওযার্ডে বসিযাই প্রতি মুহূর্তেব সংবাদ পায়,—কোন্ রাজবন্দী অজ্ঞান হইয়া গিযাছেন,—কাহাকে জোর করিয়া নলের সাহায্যে নাক দিযা দুধ খাওযাইতে গিয়া যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পড়িযাছে,—কে বিছানায় কেবলই ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা-কণ্টক আরম্ভ হইয়াছে,—কাহার ওজন কত পাউণ্ড কমিযাছে। শুনিতে শুনিতে তাহাদেরও রক্ত গরম হইযা ওঠে। তাহারাও তো ভদ্রসন্তান, এবং রাজবন্দীদের অপেক্ষা শিক্ষায়, দীক্ষায় ও সামাজিক পদমর্যাদায কোনো অংশে হীন নয়। সুতরাং তাহারাই বা "সরকার সালাম" করিবে কেন? এবং ছাপাখানাতেই বা কাজ করিবে কেন?

ইহা লইয়া দিন দুই নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইল। দেখা গেল, তাহাদের সকলেরই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে জেলার আসিয়া এমন ভাবে ইঙ্গিতে তাহাদের শাসাইয়া গেল যে, তাহাদের এই গোপন সংকল্প যে জেলারের কানে উঠিয়াছে ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। অথচ কে যে এই ঘৃণিত গুপ্তচরের কাজ করিল তাহাও বোঝা গেল না।

কিন্তু শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার বুঝি একটা আদিম প্রবৃত্তি সকল মানুষের অন্তরেই লুকাইয়া থাকে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার সে একটা নেশা। বিশ্বেশ্বব ছিল ইউবোপীযান ওযার্ডের পাণ্ডা। সে সেইদিনই সকলকে ডাকাইযা স্পষ্টই বলিল,—নিশ্চযই তাহাদের মধ্যেই কেহ এই দুষ্কার্য করিযাছে। কিন্তু সে যেই হোক, তাহাতে তাহাদের কোনো ক্ষতিই হইবে না। কারণ, তাহাদের এই ব্যাপারে গোপন করিয়া রাখিবাব কিছুই নাই।

তাহাদের দাবী সম্বন্ধে সে একটা খসড়া করিযা আনিয়াছিল। সেটা সকলকে পড়িয়া শোনাইযা তাহাতে সকলের স্বাক্ষর চাহিল। আরও জানাইল যে, পরের দিন সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেই তাঁহাব হাতে ইহা দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। ফিরিঙ্গিরাও সানন্দে সই করিয়া দিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় জেলার আসিযা সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া গেল, তাহারা কাল সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে দাবী পেশ করিবে, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তাহাদেব এই দাবী কিছুতেই গ্রাহ্য হইবে না যদি কেহ "সরকার সালাম" না করে, কিংবা প্রেসে যাইতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। একটা রাত্রি এখনও সময় আছে। সকালে স্থিরভাবে সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিয়া যেন কাজে নামে।

জেলার আর দাঁড়াইল না, গট্ গট্ করিয়া চলিযা গেল। এবং দুই

ঘণ্টার মধ্যে কি করিয়া সংবাদটি তাহার কাছে পেঁৗছিল, তাহা কেহ ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না।

জেলার চলিয়া যাইবার পরে সকলেই অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। এবং সকলেরই মন দ্বিধাভরে টলমল করিতে লাগিল। টলমল করিবার কারণও আছে;—জেলের শাস্তি যে কত ভীষণ, তাহার স্বাদ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই এক-আধবার করিয়া গ্রহণ করা আছে কি না! অধিকন্তু তাহাদের মধ্যেই কেহ-না-কেহ গুপ্তচরের কাজ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই ব্যক্তি যে কে, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া প্রত্যেকের মন অপরের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। একতা না থাকিলে এমন কাজে হাত দেওয়া যায় না। সুতরাং কোনো কিছু স্থির হওয়ার পূর্বেই সকলে নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই ঘোষ চুপি চুপি বিশ্বেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিল।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় ঝড় বহিতেছে। সে শুধু ঘোষের পানে চোখ তুলিয়া একবার চাহিল, কোনো কথা কহিল না।

ঘোষ আস্তে আস্তে বলিল,—আমার কিন্তু গ্রিফিথের ওপরই সন্দেহ হয়, বিশু। ওকে আমি খানিক আগে সিপাহীটার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে দেখেছি।

ইহার পরে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একে ফিরিঙ্গি, স্বভাবতই দেশীয়-বিদ্বেষী, তাহার উপর সিপাহীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহা!

বিশ্বেশ্বরের মাথা গরম হইয়া উঠিল। লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—মারবো শালাকে!

ঘোষ বহু কষ্টে তাহার রাগ থামাইল। বলিল,—থাক গে। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এমন অবস্থায় আর এ কাজে হাত দেওয়া চলে না। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

অবশ্য ঘোষের অদৃষ্টে আর নূতন করিয়া কিছুই হইবার নাই।

তাহার মেয়াদ শেষ হইয়াই আসিয়াছে। এই কয়টা দিন প্রেসের কাজ করিলেই বা কি, আর না করিলেই বা কি। স্বার্থ বেশি অন্যান্য সকলেরই।

বিশ্বেশ্বর কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

ক্রমাগত ফিস্ ফাস্ করিয়া ষড়যন্ত্র করায় এবং একটা তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ক্রমাগত সচকিত ও সশংকিত হইয়া চলায় একটা মাদকতা আসে। তাহা মানুষের শান্ত বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ওই কয়টি দাবীতে বিলীন হইয়া যায়,—পৃথক সত্তা থাকে না।

বিশ্বেশ্বর অস্থির ভাবে বলিল,—তুমি এখন যাও, ঘোষ। আমি ভেবে দেখি।

ঘোষ যেমন সন্তর্পণে আসিয়াছিল, তেমনি সন্তর্পণে চলিয়া গেল।

কিন্তু কি ভাবিয়া দেখিবে সে?

শীতের রাত্রি। ফুট্ফুটে জ্যোৎস্না বাহিরে অপূর্ব রহস্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিক ছম্ছম্ করিতেছে। মাঝে মাঝে সিপাহীর ভারী বুটের শব্দ—খট্খট্ করিয়া বিকট শব্দ হয়, আবার আস্তে আস্তে মিলাইয়া যায়,—টুপ্ টুপ্ করিয়া গুটি কয়েক পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে,—থাকিয়া থাকিয়া পায়খানার ফ্লাশ হইতে হুস্ হুস্ করিয়া জল নামে। আবার সিপাহীর বুটের আওয়াজ নিকটবর্তী হয়,—আবার গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে টুপ্ টুপ্। মাঝে মাঝে পায়রাগুলি ঝট্ পট্ করে। জলের কল হইতে কনক-কঙ্কণের মতো টুং টুাং শব্দে একফোটা করিয়া জল পড়ে। অকস্মাৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বসে।

ওদিকে কয়বারই কয়েদীদের "গুণ্তি" হইয়া গেল। জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। বিশ্বেশ্বরের চোখে আর ঘুম নামে না।

কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কি সে ভাবিবে?

ধর্মঘট করার শাস্তির কথা তাহার অবিদিত নয়। কাল সকালে দাবী জানাইবা মাত্র গোটাকয়েক যমদূতের মতো পেশোয়ারী এবং সিপাহী আসিয়া তাহাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করিবে। সে প্রহারে অনেকেই অজ্ঞান হইয়া

যাইবে। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আবার নির্যাতন সুরু হইবে। এমনি করিয়া শাস্তিদাতারা যখন শাস্তি দিয়া-দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন কাহারও নির্জন 'সেল,' কাহারও 'টিকটিকি,' কাহারও বেত এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের "পেনাল ডায়েট"।

অথচ সমস্ত শাস্তির সম্ভাবনা জানিয়াও ওই রাজবন্দীর দল তাহাতে দ্বিধা করে নাই। উহারাও তাহাদেরই মতো ভদ্রসন্তান এবং মনের বলেও তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। উহারা যদি পারে, তাহারাই বা পারিবে না কেন?

না পারিবার কোনই হেতু নাই। তবু বিশ্বেশ্বরের মন স্থির হয় না,—মাঝে মাঝে সাহস জাগে,- মাঝে মাঝে এলাইয়া পড়ে। শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রে, বংশমর্যাদায় এবং মনের বলে রাজবন্দীদের শ্রেষ্ঠত্ব সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। ওই তো কতকগুলা ছেলেকে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। উহারা নিশ্চয়ই ইস্কুলের পাঠ এখনো সাঙ্গ করিতে পারে নাই। হয় তো দলে পড়িয়া, বিশেষ কিছু না বুঝিযাই জেলে আসিয়াছে। অথচ আজ দশদিন তাহারাও সকলের সঙ্গে প্রায়োপবেশন করিতেছে,—এখন পর্যন্ত তো টলে নাই। তাহারা কি ওই অতি-সাধারণ ছেলেদের চেয়েও হীন?

বিশ্বেশ্বর মুখে বলে, নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মনের মধ্যে একবিন্দুও সাহস খুঁজিয়া পায় না।

এমনি ধারা অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যেই বিশ্বেশ্বর একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

এই কয়দিনেই জেলের হাওয়া যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে সেই নাচ-গান, হাসি ও হুড়াহুড়ির চিহ্নমাত্র নাই। অকস্মাৎ বাতাস যেন

বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকের বুকের ভিতরের বায়ুও যেন ভারী হইয়া উঠিতেছে।

দু'টি কয়েদীতে একত্র হইলেই শুধু স্বদেশী বাবুদের কথা। কাহার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, কাল দুপুরে কে বিছানায় পড়িয়া ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে,—কাহার মা মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে বসিয়া আহার গ্রহণের জন্য সকাতরে বৃথাই অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন,—কেবলি এই সব কথা।

এমন সময় হয় তো ব্যস্ত ভাবে জেলার কয়েকজন সিপাহী ও পেশোয়ারী লইয়া তাহাদেরই পাশ দিয়া চলিয়া যায়। কয়েদীদের দুর্বল চিত্ত ভয়ে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া ওঠে। তাড়াতাড়ি তাহারা তফাৎ হইয়া বসে,—পাছে কেহ সন্দেহ করে। কিন্তু জেলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহার মনে অন্য দুশ্চিন্তা!

জেলের ঘণ্টা বাজিলেই গভীর আশংকায় তাহারা উৎকর্ণ হইয়া ওঠে,—"পাগ্‌লা ঘণ্টি" নয় তো! এবং এই ভয় ও দুশ্চিন্তার পাশাপাশি আরও একটি ক্ষীণ স্রোতোধারা হৃদয়ের ক্ষেত্র দিয়া অতি সঙ্গোপনে বহিয়া চলিতেছে। হয় তো মিথ্যা আশা, অলীক কল্পনা,—এবং এ কথা পাশের লোকটির কাছে মুখ ফুটিয়া বলিবার পর্যন্ত সাহস নাই,—তবু, আনন্দপারাবারের মুমূর্ষু জোয়ারের সর্বশেষ তরঙ্গটি সকলেরই বুকে একটুখানি ছোঁয়া দিয়া যায়। সকলেই মনে মনে আর্তকণ্ঠে ডাকে,—হে ভগবান, আমাদেরও দয়া কর। আমরাও যে আর পারি না।

কিন্তু ভগবানের দয়া করিবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। তাহাদিগকে নিয়মিতই খাটিতে হয়। ভগবানের দয়ায় বিনা আয়াসে ঘানি হইতে তেল বাহির হয় না, পাথরও নরম হয় না। শুভ লক্ষণের মধ্যে কেবল এইটুকু দেখা গেল যে, তাহাদের উপর আরও কড়া পাহারা বসিয়া গিয়াছে এবং সময়ে-অসময়ে তর্জন-গর্জনের মাত্রাও কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে; আগে খোলা থাকিবার যতখানি তাহারা সুবিধা পাইত, এখন তাহাও কমিয়াছে। কড়া

পাহারায় তাহাদের কাজে যাইতে হয়, এবং কাজ শেষ হইলেই সিপাহী সকলকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া তালাবন্ধ করিয়া দেয়। কেবল স্নানাহারের সময়টুকু বাহিরে থাকিতে পায়। তাও তাড়ার উপর তাড়া,—জল্‌দী, জল্‌দী করো।

তাহারা জল্‌দী করিয়াই সারিয়া লয় এবং রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া স্বদেশী বাবুদের কল্যাণের জন্য ভগবানেব করুণা ভিক্ষা করে। মানুষেব ঘুসের প্রতিশ্রুতিতে দেবতার ভাণ্ডার ভরিয়া ওঠে।

কোকেন-চোর নাটু তাহাদের পাড়ার কালীতলায় জোড়া পাঁঠা মানৎ করিয়াছে, নবী নওয়াজ পীরের দরগায় সিন্নি মানিযাছে। সোনার বোতাম সেটটি বিক্রী করিয়া মহিমের গোটা পাঁচেক টাকা জমিয়াছিল, সুদে-আসলে তাহা কিছু বাড়িযাছে। একদিন সন্ধ্যায় স্পেশাল ওযার্ড হইতে ফিবিযা অকস্মাৎ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া সেই সযত্নসঞ্চিত অর্থ হইতে বুড়া-শিবতলায় পাঁচ সিকার ভোগ সে মানিয়া বসিল। তাহাদের গ্রামের বুড়াশিব অতি জাগ্রত দেবতা। তাঁহার কৃপায় বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়,—বাত, হাঁপানী, অম্লশূলের রোগী তো ডুলিতে করিয়া যায় এবং হাঁটিয়া ফিরিয়া আসে।

মহিম মানতের কথা গোপন করিয়া শুধু বুড়াশিবের মহাত্ম্যের কথাই সকলকে শুনাইয়া দিল। গ্রাম হইতে কিছু তফাতে বাদশাহী সড়কেব ধারে অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির। কতকগুলি বট ও নিমেব চারাগাছেব উৎপাতে মন্দিরের সর্বাঙ্গে ফাট ধরিয়াছে। পাশেই একটা বিপুলায়তন বটবৃক্ষ।

মহিম বুড়াশিবের কথা ভুলিয়া গিয়া বলিল,– অতবড় বটগাছ আমি জীবনে দেখি নি,—জীবনে দেখি নি। দিনের বেলায তার নিচে কিছু দেখবার উপায় নেই,—এমন অন্ধকার। আর শালা, রাজ্যেব বাদুড় কি সেই গাছে? কিছু না হবে তো পাঁচ-সাত লাখ,—সমস্ত দিন গাছের ডালে পা আটকে ঝুলছে।

মহিম প্রত্যেকের মুখের পানে এক একবার করিয়া চাহিয়া হাসিল।

সকলের মুখ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে হাঁ হইয়া গেল।

কেবল নাটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আপন মনেই হাসিল,—তাহাদের পাড়ার মা-কালীর মন্দিরের সমস্ত মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধানো।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে রঘুবীর সিং। বেষ্টো ইহার জিম্মা হইতে পলাইযা যাওয়ায় কর্তব্য-কর্মে অবহেলার জন্য বেচারীর ছয়মাস জেল হইয়াছে। এই বঘুবীর সিংএর চোখ পাকানোর চোটে কয়েদীরা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, তখন ইহাকে যমদূতের মতো দেখাইত। কিন্তু সেই বঘুবীর সিপাহীর পোষাক ছাড়িয়া কিছুদিন পবে যেই জেল-পোষাকে আসিয়া উপস্থিত হইল, সবাই তো হাসিযা খুন। কেহ চিমটি কাটিয়া দেয়, কেহ টিকি ধবিযা টানে, কেহ বা অকারণেই মাথায একটা চাঁটি মারে। রঘুবীবকে সমস্তই মুখ বুঁজিয়া সহ্য কবিতে হয। জলে বাস করিযা কুমীবের সঙ্গে বিবাদ কবা তো সমীচীন নয়। এখন স্বদেশী বাবুদের ধর্মঘটের ফলে তাহার উপব আব কেহ উৎপীড়ন করে না। সকলেরই মন চঞ্চল।

নাচ-গান বন্ধ হওয়ায় কেবল কানাই মাঝে-মাঝে আফশোষ করে। এত শোক তাহার ভালো লাগে না। বলে,—ওদের ধর্মঘট তো আমাদের কি বাবা? বেল পাকলে কাকের কি?

নাটু চোখ পাকাইয়া ধমক দেয়,—চোপ্ শালা!

কানাই গজ্ গজ্ করিতে করিতে শুইয়া পড়ে।

বিশ্বেশ্বর নিদ্রা হইতে উঠিযা কেবল চোখ রগড়াইতেছে, এমন সময় নবী নওযাজ আসিয়া একগাল হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল,—

খুব ভালো খবর মাস্টের, স্বদেশী বাবুদের জিৎ হ'য়েছে।

বিশ্বেশ্বরের নিদ্রার ঘোব তখনও কাটে নাই,—নবী নওযাজের কথা বুঝিতে তাহার দেরী হইতেছিল।

নবী নওযাজ পিছনে কেহ আছে কি না, আর একবার দেখিযা লইযা অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল,- কাল সন্ধ্যের পর খবব

এসেছে, স্বদেশী বাবুদের আর "সরকার সালাম"ও করতে হবে না, ছাপাখানায় কাজও করতে হবে না।

বলিয়া যেন তাহার নিজেরই জয় হইয়াছে, এমনি ভাবে সগর্বে হাসিতে লাগিল। তখন বিশ্বেশ্বরের চোখের সম্মুখে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

নবী নওয়াজের নিজের একটু স্বার্থ ছিল। স্বদেশী বাবুদের দেখা-দেখি যদি "সাহেব-ওয়ার্ড" একটা কিছু করিতে পারে তাহা হইলে, চাই-কি, তাহারাও একদিন কোমর বাঁধিয়া নিজেদের দাবী জোর গলায় জানাইতে পারে। কিন্তু 'সাহেব-ওয়ার্ড'-এর কয়েদীরা এমন ভাবে তাহাদের ওয়ার্ডে বন্ধ থাকে যে, বাহিরের সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নয়। সেজন্য সে নিজের গরজেই তাহার 'মেটের পেটি'র জোরে তাহাদের ওয়ার্ডে আসিয়া গোপনে বিশ্বেশ্বরের কাছে সকল সংবাদ দিয়া যায়। এই গোয়েন্দাগিরি ধরা পড়িলে শাস্তির আশংকা আছে। কিন্তু ভাবি স্বার্থের লোভে সেটুকু বিপদ সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নবী নওয়াজের বেশিক্ষণ বসিবার সময় ছিল না। কথাটা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইল।

বিশ্বেশ্বরের মনে তখন প্রবল আনন্দের ঝড় বহিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সকলকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং অতঃপর তাহাদের কি করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধেও মতামত প্রার্থনা করিল। রাজবন্দীদের জয়ে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই আপন-আপন ধর্ম সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—যতদিন তাহাদের দাবী পূর্ণ না হইবে, ততদিন কেহ কাজে যাইবে না, কিংবা আহার গ্রহণ করিবে না। তাহাদের উপর যত কিছু উৎপীড়নই চলুক না কেন, তাহারা কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইবে না।

উৎসাহে বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি, সকলের প্রতিজ্ঞাশেষে একতা ও তাহার শক্তিসম্বন্ধে উদাহরণ সমেত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়া বসিল, এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না আসা পর্যন্ত সকলকে নিজের নিজের ঘরে শান্ত ভাবে অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া সে নিজের

ঘরে চলিয়া আসিয়া সংগ্রাম-পরিচালনার উপায়-উদ্ভাবনে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু সাতটা—আটটা—নয়টা বাজিয়া গেল, না জেলার না সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কাহারও আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আটটার মধ্যে মারধোর যা হোক একটা কিছু হইয়া যাইবে, সকলেই সেজন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। এমন ভাবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা চলে না। জেল-কর্তৃপক্ষের কাহাকেও না দেখিয়া সকলেই ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এবং সেই উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া একে একে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশ্বেশ্বরের ইহাতে একটু আপত্তি ছিল। সে নেতা সাজিতে চায় না,—নেতৃত্বের অনেক বিপদ আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাদের নেতা কে? এবং নেতৃপদের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিরও গুরুত্ব বাড়িবে। সেই জন্য সে সকলকে এই কথাই বলিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদের কোনো বিশেষ নেতা নাই।

আর তাহারই ঘরে সকলের সমাবেশ!

সে সকলকে নিজের-নিজের ঘরে যাইবার জন্য আদেশ করিল।

এমন সময় নিচে অনেকগুলো বুটের শব্দ শোনা গেল। সুতরাং যাহারা নিজের-নিজের ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়াছিল, তাহাদেরও আর চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। সকলেই স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে-দেখিতে জেলার একদল সার্জেণ্ট ও সিপাহী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

জেলার আসিয়া বলিল,—বিশ্বেশ্বর, তোমাকে একবার আফিসে যেতে হবে।

বিশ্বেশ্বরের মুখ শুকাইয়া গেল। সে নীরবে বাহিরে আসিতেই দু'জন সিপাহী তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

এইবারে বাকী সকলের পালা। জেলার তাহাদের পানে অনেকক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এবং তারপরে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—তোমরা তা হোলে ধর্মঘট করাই স্থির করলে? উঁ?

ভয়ে এবং ভাবনায় কাহারও মগজে তখন আর কিছু প্রবেশ করিতেছে না। চিরদিনের অভ্যাস মতো ওইটুকু ঘরের মধ্যেই একেবারে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া তাহারা তখন সারিবন্দী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাহারও মুখে কথা ফুটিতেছে না।

জেলার আবার এক ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি স্থির করলে? উঁ?

কিন্তু উত্তর দিবে কে? জেলারের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও কেহ সাহস করিতেছে না। সকলে কাঁপিয়া, ঘামিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

মিনিট খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জেলার উত্তরের প্রতীক্ষায় প্রত্যেকের মুখের পানে একবার করিয়া চাহিল। বাহিরের সার্জেণ্ট ও সিপাহীগুলা যুদ্ধের ঘোড়ার মতো অস্থির ভাবে পা ঠুকিতেছে। ইহারা বীর পুরুষ, অনর্থক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। জেলার হুকুম দিলে ইহারা নিমেষ ফেলিতে-না-ফেলিতে বন্দীদের মারিয়া শোয়াইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পাবে। কিন্তু জেলারের আদেশ আসিতে দেরি হইতেছিল।

কয়েদীদের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে মনে হাসি আসিতেছিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া সে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আদেশ দিল,- যারা কাজ করতে চায়, তারা নিচে লাইনবন্দী দাঁড়াক।

মিনিটখানিক কয়েদীদের নড়িবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাহারা বোধ হয় পাথরের মূর্তির মতো অচল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেলার জোরে মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া তাহাদের দিকে এক পা আগাইয়া আসিতেই তাহারা সুড়্ সুড়্ করিয়া একে একে নিচে চলিয়া গেল।

পিছনে দাঁড়াইয়া জেলার আর একবার উদ্যত হাসি চাপিয়া গেল।

কিন্তু এত শীঘ্র ব্যাপারটি শেষ হইয়া যাওয়ায় সিপাহী রাম-আশিস্ সিংএর আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। হাতটা তাহার নিস্ পিস্ করিতেছিল। মনের ক্ষোভ চাপিতে না পারিয়া সে বিরক্তিভরে বলিল,- -জেনানা আদ্মী কাঁহাকা!

[১২]

সমস্ত দিন বিশ্বেশ্বরের আব কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। সে যে কোথায় আছে এবং কি শাস্তি ভোগ কবিতেছে তাহার কিছুই কেহ জানিতে পাবিল না। সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করিতে গেলে জবাব মেলে না। যাহারা ভালো মানুষ তাহাবা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত তেজস্বী তাহারা ধমক দেয়, -আপনা কাম করো জী। দুস্‌বে কো বাৎ মৎ পুছনা।

হয় তো তাহারাও কিছু জানে না। কি কবিয়া জানিবে? জমাদাব আসিয়া কাঠেব পুতুলের মতো এক-এক জনকে এক-এক দবজায় বসাইয়া দিযা যায়। সেখান হইতে তাহাদেব নডিবাব উপায নাই। কিন্তু কয়েদীদেব কাছে 'জানি না' একথা স্বীকার কবিলে মর্যাদাহানিব আশংকা আছে। তাহারা যে কর্তৃপক্ষের কেহ নয এ কথা তো উহাদেব কাছে বলা চলে না '

তাহাদের ওযার্ডাবটা হয তো কিছু জানে। গ্রিফিথ তাহাকে সিগারেট দিযা এবং আরও বিবিধ প্রকারে খোসামদ কবিযা খববটি জানিতে চাহিল। ওযার্ডাব সিগারেট পকেটে পুরিল, কিন্তু কোনো উত্তর না দিযা, শুধু একটু হাসিয়া সরিয়া পড়িল।

খবর কিছুতেই জানা যায না। এবং জেল-কর্মচাবীরা যতই খববটি গোপন করিযা যায়, ইহাদেব আশংকাও ততই বাড়িতে থাকে।

অবশেষে বেলা চারিটার সময় নবী নওয়াজ পণ্ডিতকে গোপনে বলিয়া গেল, বিশ্বেশ্বরকে চৌদ্দ ডিগ্রী সেলে বাখা হইয়াছে,—সাত দিনের সাজা। এবং আরও বলিয়া গেল, ঘোষ না কে আছে, তাকে যেন বিশ্বাস করা না হয়।

পণ্ডিত বিস্মিত ভাবে বলিল,—কেন?

চলিয়া যাইতে যাইতে নবী নওয়াজ বলিয়া গেল,—সে গোয়েন্দা। সাত দিনের মধ্যেই সে ছাড়া পাবে।

পণ্ডিত তো অবাক! ঘোষ গোয়েন্দা? মাথা-পাগল মতন দেখিতে,—চুপ করিয়া থাকে,—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কথা কয়,—

কে জানে! সে-ই তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত খবর জেলারের কাছে জানাইত? কিন্তু কি করিয়া? তাহাদেব কাহারও তো বাহিরে যাইবার উপায় নাই, জেলারও তাহার মধ্যে ভিতরে আসে নাই। তবে? আর এত খবর ওই লোকটিই বা জানিল কি করিয়া?

কিন্তু পণ্ডিত পাকা লোক। কথাটি কাহারও কাছে ফাঁস করিল না, চাপিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে গ্রিফিথ নিচে হইতে আসিয়া বলিল,—খবর শুনেছ?

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল,—না। কি খবর?

উত্তেজনায় গ্রিফিথের যেন স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে কোনো মতে বলিল,—এমন ক'রে তাকে বেত মারা হ'য়েছে যে, সে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে প'ড়ে আছে।

কথাটা শুনিয়া কাহারও আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না,—সকলেই গ্রিফিথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষের মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল। সে মুখ চুণ করিয়া মৃদুস্বরে কেবল বলিল,—না, না।

গ্রিফিথ বিরক্ত ভাবে বলিল,—না তো কি আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে গেল?

পণ্ডিত ধীর ভাবে প্রশ্ন করিল,—খববটা দিলে কে?

সে কথা গ্রিফিথ বলিবে না। তবে সংবাদটি যে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গিয়াছে তাহার সে বিষয়ে সংশয় নাই।

পণ্ডিত বিশ বাঁও জলে গিয়া পড়িল। সেও একটা সংবাদ পাইয়াছে।

কিন্তু সে অন্যরূপ। এবং তাহার সংবাদদাতার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সে গ্রিফিথের মতো অতখানি নিঃসংশয়ও নয়। বিশেষ, ঘোষের সম্বন্ধে নবী নওয়াজ যাহা বলিয়া গিয়াছে, অন্য কেহ হইলে তাহা তো তখনি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু পণ্ডিত নাকি ঝানু লোক, মানুষের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কোনো কিছুই এক কথায় ঠেলিয়া ফেলে না, তাই সে-কথার জের এখনও মনে-মনে টানিতেছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি এখন হাসপাতালেই থাকবে?—না এই-খানেই ফের নিয়ে আসবে?

তাহাকে যে এই ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোথাও রাখিতে পারে, এ প্রশ্ন গ্রিফিথের মনে আদৌ ওঠে নাই। সে বোকার মত বলিল,—সে কথা তো জিজ্ঞেস করি নি।

কথাটা মিথ্যা হইলে ঘোষ যেন বাঁচিয়া যায়। সে সাগ্রহে বলিল - তা'হোলে খবরটা হয় তো সত্যি নয়, গ্রিফিথ।

গ্রিফিথ দাঁত বাহির করিয়া ভেংচাইয়া বলিল,—না সত্যি নয়!

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আর একটা নূতনতর খবর পাওয়া গেল,—

বিশ্বেশ্বরকে এখান হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান করা হইয়াছে। খবরটা আনিল জোসেফ, এবং এই অজ্ঞাত-নামা সংবাদদাতার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও জোসেফের সন্দেহ নাই।

সে আরও বলিল, মারের খবরটা সত্যি, কিন্তু অতখানি নয়। একটা সিপাহী তাহাকে গোটা দুই ব্যাটনের গুঁতো দিয়াছিল মাত্র। বিশ্বেশ্বর চ্যাঁচাইয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞান হইয়া যায় নাই। আর হাসপাতালে আনার খবরটা ডাহা মিথ্যা,—ডাহা মিথ্যা। বলিয়া তাহার মুঠোটি দুম্ করিয়া টেবিলের উপর ঠুকিল।

কিন্তু বহু কষ্টে এবং অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া গ্রিফিথ যে খবর সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা এত সহজে এক কথায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। তাহার খবর যে সত্য, তাহা সে বারংবার জোর গলায় প্রচার করিতে

লাগিল। পক্ষান্তরে জোসেফও নিরস্ত হইবার পাত্র নয়,—তাহাকেও সংবাদ-সংগ্রহে কম বেগ পাইতে হয় নাই। এমনি ভাবে উভয় পক্ষ অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া শেষে যখন আর তাহাতে পোষাইল না, তখন উভয়েই আস্তিন গুটাইয়া ঘুঁসি বাগাইয়া দাঁড়াইল।

হয়তো মুষ্টি-যুদ্ধই হইত, কিন্তু জেলার আসিয়া পড়ায় সে সুবিধা আর ঘটিয়া উঠিল না। উভয়েই উদ্যত মুষ্টি সংবরণ করিল। গ্রিফিথের যেন রোখ চড়িয়া গিয়াছিল। জেলার-কয়েদী-সম্বন্ধ ভুলিয়া সে সটান জেলারের কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল,—I say Mr. Graham, বিশ্বেশ্বর কোথায়?

জেলার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—You demand that of me, do you?

গ্রিফিথ ভয়ে দুই পা পিছাইয়া আসিল।

জেলারের রাগিয়া উঠিতে এক মিনিটের বেশি দেরী হয় না। কিন্তু কেহ তাহার ক্রোধকে ভয় করিতেছে জানিতে পারিলেই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। সে হাসি দেখিয়া কয়েদীরা আবার তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

জেলারের কাছেই সত্য সংবাদ পাওয়া গেল। গ্রিফিথ এবং জোসেফ দু'জনের সংবাদই মিথ্যা,—পণ্ডিতকে নবী নওয়াজ যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাই সত্য। অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরকে চৌদ্দ ডিগ্রি সেলে সাত দিনের জন্য নির্জন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে জেলার বন্ধুভাবে বলিল,—ছোকরার জন্যে আমি সত্যই ভারি দুঃখিত। কিন্তু ধর্মঘট করার মতলব কি ক'রে যে ওর মাথায় এলো! অথচ, আমি নিজে এসে বার বার নিষেধ ক'রে গেছি। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে-পায়ে ধরলে দু'তিন দিন পরে ছেড়েও দিতে পারে। আমি নিজেও তার জন্যে চেষ্টা করব। Poor fellow!

হয়তো করিবে। স্ত্রীর ভয়ে সে প্রায়ই বাহিরে বাহিরে ফিরে।

কয়েদীদের ক্রমাগত খবরদারী করিয়া তাহাদের উপর একটু মমত্ববোধও জন্মিয়া যায়। যাহারা অনেক জেলের জল খাইয়াছে তাহারা বলে, এমন জেলার বড় একটা দেখা যায় না।

কি করিয়া যে চৌদ্দ ডিগ্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এখন আব বিশ্বেশ্বর তাহা স্মরণ করিতে পারে না। দুই জন সিপাহী যখন তাহাকে লইয়া বাহির হইল, সে মনে কবিল ইহলোকের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—এ পৃথিবীর সম্বন্ধে আর কিছু না ভাবিলেও চলিবে।

অমনি একটা মানসিক অবস্থা লইয়া সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সম্মুখীন হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেশী লোক, দেশী লোকেব দরদ, অন্তত মনে মনেও বোঝেন। কিন্তু তিনি যে কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সে তাহার আদৌ উত্তর দিয়াছিল কিনা অথবা কি উত্তর দিয়াছিল, স্মৃতিপটে তাহার আর চিহ্নমাত্র নাই। যে দু'টি সিপাহীর সঙ্গে নিজের ওযার্ড হইতে বাহির হইয়াছিল, একান্ত বিহ্বল ভাবে আবার তাহাদেবই সঙ্গে চৌদ্দ ডিগ্রিতে আসিযা উপস্থিত হইল।

একতলা একখানা বাড়ি,—মধ্যে পাঁচীল দিযা অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে দু'টি করিয়া 'সেল,'—সুমুখে ছোট একফালি উঠান। 'সেল'-এর প্রবেশপথে আব একখানি করিযা ছোট্ট ঘর এমন ভাবে নির্মিত যে, ভিতব হইতে বাহিবের কিছু দেখিবাব উপায নাই,- এক টুকবা আকাশ পর্যন্ত না।

এমনি একখানি ঘরে অনেকক্ষণ কম্বল বিছাইয়া শুইযা থাকিবাব পর বিশ্বেশ্বরের চেতনা ফিরিযা আসিল। ধীরে ধীবে সে বুঝিল, তাহাকে 'সেল'-এ আবদ্ধ রাখা হইযাছে। কিন্তু জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তীব্র দৃষ্টির ও পুনঃ পুনঃ অস্বস্তিকর প্রশ্নেব হাত হইতে বক্ষা পাইযা প্রথমটা

'সেল'ও তাহার স্বর্গ মনে হইল। সে পরমানন্দে একটা গান ধরিয়া দিল।

কিন্তু গান গাহিয়া আর কতক্ষণ কাটান যায়! সে আস্তে আস্তে উঠিয়া লোহার শিক দেওয়া দরজায় চোখ লাগাইয়া দেখিল,—সম্মুখের একটি নির্জন ঘর, তাহার ওপ্রান্তে আবার একটা দরজা। সেই দরজার ওদিকে কিছু দেখা যাইতেছে না বটে কিন্তু ভারি বুটের শব্দ শুনিয়া মনে হয়, ওখানে একটা সিপাহী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বেশ্বর সবিনয়ে ডাকিল,—সিপাহী জি!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু সিপাহীর বুটের শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল, ডাক সম্ভবত তাহার কানে পৌঁছিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর আরও করুণ স্বরে ডাকিল,—এ সিপাহী জি!

একটা ভারি গলায় উত্তর আসিল,—কেয়া?

—একঠো বিড়ি তো পিলাইয়ে।

আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না; বুট আবার টহল দিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।—তাইতো! ধূমপানের কোন সুবিধা নাই যে! সে নিরুপায় ভাবে আবার কম্বলের উপর শুইয়া পড়িল। সে দিন এবং সে-রাত্রি একবার বসিয়া, একবার শুইয়া এবং দু'বেলা দু'মুঠা আহার করিয়া কোনো রকমে কাটাইয়া দিল। বহুদিন গুরু পরিশ্রমের পর এ বিশ্রাম তাহার মন্দ লাগিল না। কষ্টের মধ্যে ধূমপানের অভাব এবং রাত্রের ছারপোকা। মশাও আছে; কিন্তু এখনও শীত যায় নাই, আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। কিন্তু ছারপোকার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় নাই।

হ্যাঁ, ছারপোকা বটে। একশো নয়, দু'শো নয়, একেবারে অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনী,—নানাভাগে বিভক্ত হইয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করে। মাঝে মাঝে ঘটোৎকচের মতো সে ইহাদের উপর দিয়া নিজের দেহটা রোলারের মতো চালাইয়া দেয়,—রক্তে তাহার শরীর ভিজিয়া যায়। তবু কি

ইহাদের সংখ্যা কমে? আবার কোথা হইতে নূতন আর একদল আসিয়া দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করে। বিশ্বেশ্বরের গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, লজ্জায় পারে না। বিছানায় শুইয়া শুইয়া কুস্তি করে।

ভোরের দিকে ছারপোকা বাহিনী আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবার পর তার চোখে নিদ্রা নামিল। কিন্তু সে নিদ্রা ভালো করিয়া জমিতে না জমিতেই সিপাহী তাহাকে প্রাতঃকৃত্যের জন্য উঠাইয়া দিল।

বাহিরে আসিতেই গভীর পরিতৃপ্তিতে সে বলিয়া উঠিল আঃ!

এই বরিকর এবং ওই আকাশ সে যেন বহুদিন দেখে নাই।

কিন্তু আধঘণ্টা মাত্র সময়। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিবার পর আর আকাশ দেখিবার বেশি অবকাশ মিলিল না।

আবার সেই সেল।

একটা সিগারেট পাওয়া যায় না? অন্ততঃ একটা বিড়ি? কিন্তু সিপাহীটা ডাকিলে সাড়া দেয় না কথা কহিতে গেলে কথা কয় না। নিয়ম নাই না কি?

হঠাৎ মনে পড়িল সেই ছারপোকাগুলা? তাহার পোষাক রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে—হাত ও পায়ের নিম্নার্ধ বসন্তের গুটির মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কম্বল উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও জীবিত ছারপোকার চিহ্নমাত্র পাইল না।

সে পরম পরিতোষের সঙ্গে সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। একে অনিদ্রা তার উপর সারারাত ছারপোকার সঙ্গে কুস্তি! তাহার সর্বশরীর কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল। তবু শুইয়া থাকিতে পারিল না। শুইয়া থাকিতে কতক্ষণ ভালো লাগে? সে আবার উঠিয়া দেওয়ালগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ একজায়গায় দেখিল নখে করিয়া চুণবালি কাটিয়া একজায়গায়

লেখা আছে নরহরি। আঁকা বাঁকা লেখা,—তাহার উপর এক পোঁচ চূণও পড়িয়াছে, তবু পড়া যায়।

বাঃ, মন্দ নয় তো!

নরহরিকে সে চেনে না। কিন্তু এক পালকের পাখী নিশ্চয়ই। তাহার মনে হইল, ও তো শুধু কয়েকটি অক্ষরে লেখা তাহারই কোনো হতভাগ্য সতীর্থের নাম নয়, ও যেন নরহরি স্বয়ং। ওর সঙ্গে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করা যায়। সে মুগ্ধ নেত্রে অপটু হস্তের ওই কয়টি হরফের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় বাহিরে তালা খোলার শব্দ হইল,—পর পর দুইটি তালা। এবং তারপরেই সিপাহীকে পুরোবর্তী করিয়া একজন কয়েদী তাহার ভাত লইয়া আসিল। কালকের সেই লোকটি নয়,—ইহাকে যেন চেনা চেনা মনে হইল, বোধ হয় নবী নওয়াজের ওয়ার্ডে দেখিয়া থাকিবে—কিংবা অন্য কোথাও।

লোকটি ফিক্ করিয়া একটু হাসিল মাত্র। কোনো কথা না কহিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল,—সিপাহীটিও। আবার পর পর দুইটা তালা পড়িল,—ঘটাং ঘট্।

চেনা লোকই বটে। তাহাকে দেখিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়াও গেল। বিশ্বেশ্বরের আপশোষ হইল, উহার নিকট তাহাদের ওয়ার্ডের ধর্ম-ঘটের খবরটা লওয়া হইল না!

—সিপাহী জি!

উত্তর আসিল না।

বিশ্বেশ্বর আবার সকাতরে ডাকিল,—এ সিপাহী জি!

—কেয়া?

কালকের সেই সিপাহীটি নয়,—ইহার গলা অতখানি বাজখাঁই নয়, একটু মিষ্টত্ব আছে।

সাহস পাইয়া বিশ্বেশ্বর সবিনয়ে বলিল,—শুনিয়ে।

—বলিয়ে না।

একটু ইতস্তত করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—সাহেব ওয়ার্ডকো ধরমঘট চল্‌তা হৈ?

বাৎ মৎ বোল্‌না বাবুজি,--বাৎ বোল্‌নে মানা হৈ।

তাড়াতাড়ি বিশ্বেশ্বর বলিল.--স্রেফ এহি এক্‌ঠো বাৎকো জবাব দেও সিপাহীজি. আউব দুস্‌রে বাৎ নেহি পুছেঙ্গে।

সিপাহীটা একটুক্ষণ কি ভাবিয়া মৃদুস্বরে বলিল,- ধরমঘট নেহি হুয়া।

নেহি হুয়া? একদম নেহি হুয়া?

আব কোনো জবাব মিলিল না।

বিশ্বেশ্বরের ক্ষুধা ছিল না। তবু যা-হোক্ দুমুঠা এখনই খাইয়া লইতে হইবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ও ভাত আর মুখে দিবার উপায় থাকিবে না।

কিন্তু মিছামিছি এ কী দুর্ভোগ! নির্জন কারায় সহস্র কষ্ট ভোগ করিয়াও সে মনে মনে এই সান্ত্বনা পাইতেছিল, সে একজন martyr—আপাতত নিজের জন্য হইলেও ভবিষ্যতে তাহারই মতো আব যে সমস্ত হতভাগ্যকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আশ্রয লইতে হইবে. তাহাদের সকলের জন্য সে মস্ত বড় একটা কিছু করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সে গৌরব রহিল কোথায়? তাহার সঙ্গীরা তাহাদের দাবী বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে। এখন আর এই দুঃখভোগের সার্থকতা কি? নিজের ভাগ্যের উপর বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনর্থক দুঃখভোগ করাই বুঝি তার বিধিলিপি।

ক্রোধে, ক্ষোভে ও অনুশোচনায় তাহার গলা দিয়া ভাত যেন আর নামে না—তবু দলা-দলা সেই পিণ্ড উদরে পেঁছাইয়া দিতে হয।

হঠাৎ ভাতের মধ্যে কি যেন তাহার হাতে ঠেকিয়া খড় খড় করিয়া

উঠিল। তাড়াতাড়ি মধ্যের ভাত একপাশে ঠেলিয়া রাখিতেই দেখিল, এক টুক্‌রা কাগজ সযত্নে ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলিতেই চোখে পড়িল, বেশ স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—কিছুমাত্র ভাবিও না। তোমার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টায় আছি।

কে এই 'আমরা,' এবং তাহার জন্য কি বিশেষ চেষ্টায় আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। হাতের লেখাও চিনিতে পারিল না। কিন্তু এই দুই ছত্র লেখার মধ্যে তাহার মুক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কবে চেষ্টা করিবে তাহারা? কবে এই পাতালপুরী হইতে মুক্তি পাইবে সে?

রাত্রে ঘুম হয় নাই, দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। সময়ও তো কাটানো চাই। কিন্তু ঘুম যেন চোখ হইতে পলাইয়া গিয়াছে। ঘুম আসিল না, বার বার চিঠিখানিই পড়িতে লাগিল। কিন্তু এক চিঠি কতবারই বা পড়া যায়? বিছানা ছাড়িয়া আবার সে দেওয়ালে আর কোথাও কিছু লেখা আছে কি না, দেখিবার জন্য উঠিল।

পিছনের দেওয়ালে ইহার মধ্যে সে একবারও তাকায় নাই। সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল,—ওটা রক্তের দাগ নয়? রক্তের দাগই তো,—একবার চূণকাম করা হইয়াছে বটে, তবু স্পষ্ট রক্তের দাগ!

বিশ্বেশ্বর সেই দিকে সরিয়া আসিল,—বন্দে মাতরম্‌।

রক্তের দাগই বটে,—কিন্তু মানুষের নয়, ছারপোকার। ইতিপূর্বে আর একজন কেউ তাহারই মতো রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই। একটি একটি করিয়া ছারপোকা মারিয়াছে, আর তাহারই রক্তে লিখিয়াছে, বন্দে মাতরম্‌।

লোকটি তাহার চেয়ে বুদ্ধিমান নিশ্চয়। সমস্ত রাত্রি কুস্তি করার চেয়ে রাত্রি কাটাইবার এই কৌশলই ভালো। বিশ্বেশ্বর মনে মনে একচোট হাসিয়া লোকটির বুদ্ধির তারিফ করিল।

কিন্তু নির্জন কারাবাসের ক্লেশই এই যে, কোনো একটা বিষয়ে মনঃসংযোগের শক্তি থাকে না। বিশ্বেশ্বর আবার চারিদিকের দেওয়াল দেখিয়া ঘুরিতে লাগিল। বহু লোকই নখে খুদিয়া তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিয়া

গিয়াছে। তাহার মনে হইল, এ যেন একখানি ইতিহাস।—মানুষের নয়,—এই কারাকক্ষের,—বহু মানুষের পায়ের স্পর্শে এই পাষাণী যেন প্রাণ পাইয়াছে। এ যেন একটি সজীব, মূক প্রতিমা, ওই কয়টি লেখায় আপনার ব্যথিত হৃদয়-দুয়ার উদ্ঘাটিত করিতেছে। উহারই ব্যথা মানুষের ব্যথায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

দেওয়ালে দেওয়ালে বহু লোকের নামই লেখা আছে, একটি নারীরও। মেয়েটি নিশ্চয় এখানে আসে নাই। হয় তো তাহার প্রিয়তম নিজের নাম না লিখিয়া ওই দেওয়ালে তাহারই নাম লিখিয়া গিয়াছে।

সেই নামটি দেখিতে দেখিতে তাহার মাথায় ভূত চাপিল। সে-ও নখে করিয়া লিখিতে বসিল,—একটি মেয়ের নাম, কিন্তু অমলার নয়,- কাহার তা সে-ও জানে না। তার নিচে আর একটি মেয়ের নাম, তার নিচে আর একটি। এবং বেশ করিয়া সেই তিনটি নাম পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বার বার দেখিয়া, বদ্ধ পাগলের মতো হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার নূতন দু'টি খেলার সাথী জুটিয়াছে।-

একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে এই ঘরে আহার অন্বেষণের জন্য আসে। ঘুলঘুলির ওদিকে কোথাও থাকে সে। সেখান হইতে কালো কালো চোখ নাচাইয়া সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া অতি সাবধানে আঁকিয়া বাঁকিয়া দেওয়াল বাহিয়া নামে। তাহার দুর্বল গতিভঙ্গি দেখিতে বিশ্বেশ্বরের কৌতুক বোধ হয়।

এই কৌতুক একদিন টিকটিকিটির পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিল। একটা মাছি কাছেই দেওয়ালের গায়ে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পিছনের দু'টি পা দিয়া পাখা সাফ্ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া টিকটিকির লোভ জাগিল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাছিটার পানে চাহিয়া বিদ্যুৎ-বেগে গিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য কেবল উদ্যম করিতেছে, এমন সময় বিশ্বেশ্বর গিয়া তাহার লেজটি আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিল।

শিকার করা আর হইল না। টিক্‌টিকিটা ডাহিনে বামে কোমর হেলাইয়া প্রাণপণ নিজেকে বিশ্বেশ্বরের কবল হইতে মুক্ত করিয়া একদিকে দৌড় দিল বটে, কিন্তু লেজটুকু আর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না; বিশ্বেশ্বরের কাছেই রহিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত দুঃখ হইল;—যদি টিক্‌টিকিটা আর না আসে! এবং টিক্‌টিকিটা আর না আসিলে সে কি করিয়া দিন কাটাইবে ভাবিতে গিয়া সত্য সত্যই বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ দিন কাটাইবার ও-যে মস্ত বড় একটা অবলম্বন। বিশ্বেশ্বর বার বার আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু টিক্‌টিকির লজ্জা নেই। লাঙ্গুলের দুঃখ ভুলিতে তার দেরি হইল না। পাঁচ মিনিট পরেই দেখা গেল আবার সে ঘুল্‌ঘুলির ভিতর দিয়া চোখ নাচাইয়া অতি সন্তর্পণে ঘরের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় সঙ্গীটি এক মাকড়সা।

নানা স্থানে জাল পাতিয়া সে যে কোথায় লুকাইয়া থাকে দেখা যায় না। কিন্তু কোনো জালের কোনো একপ্রান্ত কিছু একটা দিয়া ঈষৎ নাড়িলেই, কখনো সিলিং হইতে, কখনো বা দেওয়ালের সর্বোচ্চ প্রান্ত হইতে বড় বড় ঠ্যাং মেলিয়া নামিয়া আসে। কিছু দূর হইতে হিংস্র চোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়া দেখে, শিকার জালে পড়িয়াছে কি না।

শিকার প্রায়ই পড়ে না। বেশির ভাগ বার বিশ্বেশ্বরই জাল নাড়ে। মাকড়সাটি নামিয়া আসিয়া প্রায়ই হতাশ হয় এবং ছেঁড়া জাল মেরামত করিয়া আবার কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয়।

তাহার দুর্দশা দেখিয়া বিশ্বেশ্বর হো হো করিয়া সশব্দে হাসিয়া ওঠে। বলে,—ওরে বোকা, দু'মিনিট পর পর তোমার জালে শিকার পড়লে তো তুমি দু'দিনে ফুলে হাতী হবে। তোমার জীবনে তেমন শিকার পেয়েছ কোনো দিন?

কোনো দিনই পায় নাই। তবু শিকারীর মন কি বোঝে?

আবার কখনও কখনও জাল নাড়া দিলেও মাকড়সাটি আর নামে না।

বিশ্বেশ্বর রাগিয়া গিয়া তাহার জাল ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করে। মাকড়সাটির দুই দিকেই বিপদ।

কিন্তু ইহাদের সঙ্গে খুনসুড়ি করিতেও বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। তিন দিনেই বিশ্বেশ্বর অস্থির হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ ঘরময় দ্রুতবেগে পায়চারি করিয়া আবার হয়তো ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়ে।

তাহার বুকের মধ্যে কি যেন একটা বিপুল শূন্যতা সর্বক্ষণ হাহাকার করে,—মগজের মধ্যেও। সে স্থির হইয়া একটুক্ষণ বসিতে পারে না, স্থির হইয়া একটা কিছু ভাবিতে পারে না। কোথাও মানুষের কণ্ঠস্বর একটুকু শুনিতে পাইলে উৎকর্ণ হইয়া ওঠে। কিন্তু তাও কি শুনিতে পায় ছাই। তখন নিজের যে কোনো একটা গানের যে কোনো লাইন চীৎকার করিয়া গাহিতে আরম্ভ করে।

সিপাহী ধমক দেয়। বিশ্বেশ্বর কখনো ধমক খাইয়া চুপ করে, কখনো করে না।

কখনো হয়তো রবীন্দ্রনাথ কিংবা শেলীর একটা কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করে। কিন্তু রস না পাইয়া কবির উপরই চটিয়া যায়।

—কবিতা লিখেছে, না আমার মাথা লিখেছে।

তারপরেই হয়তো ধূমপানের জন্য মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। মুখে মুখেই সিগারেট সম্বন্ধে একটা গান বানাইয়া জোরে জোরে গাহিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু গান গাহিলে সিগারেট আসে না। বিশ্বেশ্বর হতাশ ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়ে।

—শালারা আমার জন্যে চেষ্টা করছে, না ইয়ে করছে। সব শালাদের ভাঁওতা। একবার বেরিয়ে তো যাই। তারপরে—

বিশ্বেশ্বর আবার উঠিয়া উন্মত্তভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করে।

ঘুম যেন তাহার চোখ হইতে একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কিছুতে

ঘুম আসে না। তাহার ঘরে আলো জ্বলে না, জ্বলে সুমুখের ঘরে। তাহারই স্বল্প আলো এই ঘরে আসিয়া পড়ে। একজন সিপাহী সুমুখের ঘরে বসিয়া, কখনো বা বাহিরের বারান্দায় পায়চারি করিয়া তাহাকে পাহারা দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কয় না। কথা কহিতে নিষেধ আছে।

সেই স্বল্পালোকে বিশ্বেশ্বর মাঝে মাঝে হাঁফাইয়া ওঠে। চীৎকার করিয়া বলে,—Light, more Light !

মাঝে মাঝে তাহার মানুষের সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা হয়।

—সিপাহীজি, এ সিপাহীজি!

—কেয়া ?

—তুম গ্যেটেকো নাম শুনা হৈ? উযো ভি হামকো মাফিক এ্যায়সে চিল্লায়া,—Light, more Light !

সিপাহীজি গ্যেটের নাম শোনে নাই, এবং "Light, more Light"-এরও মানে জানে না। কিন্তু সে মনে মনে বাংগালী বাবুর জন্য দুঃখিত হয়, বেচারার মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে - নিদ্ যাও বাবুজি, নিদ্ যাও।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের তাহা বোধ হয় কানেও যায় না। সে মনে মনেই গুণ গুণ করিয়া আবৃত্তি করে,- আরো আলো, আরো আলো,

পরের দিন সকালে বিশ্বেশ্বর মুক্তি পাইল।

এই কয়দিনের মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদিনও আসিয়া সংবাদ লইতে পারেন নাই। সেদিন প্রথম আসিলেন। বাহিরে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিশ্বেশ্বর দোরগোড়ায় উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি আসিতেই সে একেবারে তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 'সুপার' প্রথমটা হতচকিত হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই নিজের পা-টি তাহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং জেলারকে হুকুম দিলেন, বিশ্বেশ্বরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে।

গৃহের আরামের মধ্যে বসিয়া যাঁহারা এই কলঙ্ক-কাহিনী পড়িবেন,

বিশ্বেশ্বরের জন্য তাহারা লজ্জায় মাথা হে'ট করিবেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বর নিজে একটুকু লজ্জিত হইল না সে লাফ দিয়া উঠানে পড়িল। কিসের লজ্জা? এমন আকাশ এমন আলো 'সেলের' মধ্যে কোথায়?

তাহাকে দেখিয়াই ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের কয়েদীরা কলরব করিয়া উঠিল। গ্রিফিথ উঠানেই পায়চারি করিতেছিল। সে তো বিশ্বেশ্বরকে একেবারে কাঁধে তুলিয়া দোত'লায় লইয়া আসিল। পণ্ডিত ঘোষ জোসেফ, গ্রিফিথ গল্পে গানে হাসিতে মুখর হইয়া উঠিল। কেবল মিরাণ্ডা দূরে দূরে ঘুরিতেছিল। পণ্ডিত তাহাকে ধরিয়া আনিতেই আর একবার হাসির হিল্লোল উঠিল।

এত বড় সম্বর্ধনার জন্য বিশ্বেশ্বর প্রস্তুত ছিল না। তাহাকে নির্জন কারার কবলে পাঠাইয়া ইহারা সকল প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া দিব্য আরামে আছে এ কথা বিশ্বেশ্বর সেল এ বসিয়া যতই ভাবিয়াছে ততই তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এত বড় সম্বর্ধনার পরে তাহার আর ক্রোধ রহিল না। সে বেশ বুঝিল নির্জন কারা হইতে ফিরিয়া ইহাদের চক্ষে সে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মপ্রসাদেই তাহার মন উদার হইয়া উঠিল।

। ১৩ ।

ঘোষের কথাটা পণ্ডিত অনেকদিন চাপিয়া গিয়াছিল। নবী নওয়াজের কথা সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে নাই। অন্য কেহ হইলে এত বড় একটা রুচিকর কথা লইয়া জেলে সোরগোল পাকাইত। জেলে নূতন কথার একান্ত অভাব। দিনের পর দিন সেই একই লোক, তাহাদের সঙ্গে সেই একঘেয়ে রহস্যালাপে মন বদ্ধ জলার মতো বিষাক্ত হইয়া ওঠে। ঘোষের প্রসঙ্গ অন্তত কিছুদিন তাহাদের আলাপ আলোচনায় নূতনত্ব দিত। কিন্তু সংসারের ভালো-মন্দ সকল বিষয়েই পণ্ডিত উদাসীন। বিশেষ, সেকথা লইযা সোর-গোল করিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতেছিল।

নবী নওয়াজের অর্ধেক সংবাদ সত্য হইয়াছিল, বিশ্বেশ্বরকে নির্জন 'সেল'-এ রাখার কথাটি সত্য। অপরার্ধের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য পণ্ডিত অপেক্ষা করিয়াছিল। সেই সত্যও প্রমাণিত হইল, ঘোষের মুখ হইতেই শোনা গেল, তাহাকে কাল কিংবা পরশু ছাড়িয়া দেওযা হইবে, অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হইবার কয়েকদিন আগেই!

এ কথা শোনার পর পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক সময় নিরিবিলি পাইয়া কথায় কথায় বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আমাদের ধর্মঘটের ব্যাপারে কে গোয়েন্দাগিরি ক'রতো জানো?

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জানি।

বিশ্বেশ্বরও জানে! পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া গেল। তবে হযতো নবী নওয়াজের কাছেই শুনিয়া থাকিবে।

পণ্ডিত বলিল,—লোকটি ভারি উপকারী। কি নামটি তার?

—কার কথা ব'লছ তুমি?

—ওই যে সেই মুসলমান 'মেট'টি;—তোমার কাছে প্রায়ই আসে?

—নবী নওয়াজ?

হ্যাঁ, নবী নওয়াজ। সেই তো এসে খবর দিয়ে গেল, তোমার সাতদিন 'সেল' হয়েছে। তারই হাত দিয়ে তো তোমার কাছে চিঠি পাঠাই। তোমার জন্যে সে ব্যস্ত হযে উঠেছিল।

বিশ্বেশ্বর গাঢ় স্বরে বলিল, হ্যাঁ, লোকটি খুব ভালো।

পণ্ডিত ধূর্তের মতো কুটিল হাস্য করিয়া বলিল,- তারই কাছে তো গোয়েন্দাটিব পবিচয পেলাম। এমন কি, সাতদিনেব মধ্যে যে মহাপ্রভু ছাড়া পাবেন, তাও বলে গেল।

এবারে বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইল, কে সাতদিনে ছাড়া পাবে? গ্রিফিথ?

পণ্ডিতেব বুঝিতে দেবি হইল না, বিশ্বেশ্বব কিছুই শোনে নাই। সে গ্রিফিথকে সন্দেহ কবে।

পণ্ডিত হাসিযা বলিল তুমি কচু জানো। গ্রিফিথ কেন গোয়েন্দা-গিবি করবে?

- তবে কে কবেছে?

মিঃ ঘোষ।—বলিযা পণ্ডিত তাহাব পানে মিটিমিটি চাহিযা হাসিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বব হো হো কবিযা হাসিযা বলিল, -তোমাব মাথা খাবাপ হযেছে, পণ্ডিত। রাঁচি যাও,—রাঁচি যাও।

পণ্ডিত রাঁচি যাইবাব কোনো আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল,—তোমাব সঙ্গে নবী নওযাজেব দেখা হযেছে? হয নি? আশ্চর্য! অথচ তোমার জন্যে সে পাগলেব মতো হযে উঠেছিল। আব তুমি ছাড়া পাওযাব পবে একদিন দেখা কবতেও এলো না?

—আসবে একদিন। কিন্তু তুমি ঘোষের কথা কি শুনেছ বলো।

—ওই ত বললাম। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার পব বিকেল পর্যন্ত তোমার কোনো খবব না পেয়ে যখন আমবা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম,

সেই সময় হঠাৎ নবী নওয়াজ আমায় ডাকলে। ডেকে তোমার খবর দিলে, আর বলে গেল,—ঘোষ না কে আছে সেই গোয়েন্দা, সাতদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তখন এ কথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এখন দেখছি সত্যি।

কথাটা শুনিতে শুনিতে বিশ্বেশ্বরের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল,—কি ক'রে দেখলে সত্যি?

—এক্ষুনি শুনলাম, ঘোষ কাল কিংবা পরশু ছাড়া পাবে।

বিশ্বেশ্বর কিছুই বলিল না, চিন্তিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি—

বিশ্বেশ্বর একটু পরে কহিল, —আচ্ছা, মাস তিনেক আগে বেণ্টো জেল থেকে পালিয়েছিল, তোমার মনে আছে? আমরা অবাক হ'যে ভাবছিলাম, ছাড়া পেতে আর তো বেশি দিন ছিল না, তবু কেন নিজেকে বিপন্ন ক'রে অমন ভাবে পালালে? আরও বছর খানেক আগে একটা বুড়ো কয়েদী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে। তখনও আমরা অবাক হ'যে ভেবেছিলাম লোকটার তো বছর পাঁচেক জেল হয়েছিল,—তাও তো হাসপাতালেই প'ড়ে থাকতো, খাটতেও হোতো না,—ও কেন আত্মহত্যা করলে? আর আজকে তোমার কাছে শুনছি, ঘোষ গোয়েন্দাগিরি ক'রেছে। আরও একটা খবর জানি,—কিন্তু সে আমার নিজেরই কলঙ্ক-কাহিনী, সুতরাং সে আর বলবো না।

বিশ্বেশ্বর চুপ করিল। 'সেল' হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে সে লক্ষ্য করিতেছে, একটানা কিছুক্ষণ কথা বলিলেই তাহার হাঁফ ধরে।

দম লইয়া বিশ্বেশ্বর বলিতে লাগিল,—সব মুক্তির ক্ষুধা। ভেতরে ভেতরে আমাদের সকলের মনই মুক্তির জন্যে ক্ষুধার্ত হ'যে উঠেছে। সকল সময় টের পাইনে, কিন্তু সম্মুখে প্রলোভন এসে পড়লে, আর সামলাতে পারি নে। বন্ধনের জ্বালায় অস্থির হ'য়েই তো আমরা ধর্মঘট করতে যাচ্ছিলাম, কত বড় শাস্তির আশংকা ঘাড়ে নিয়ে! অথচ কতটুকুই বা পেতাম? তাও পারলাম না,—ভিতরে ভিতরে শক্তির ভাণ্ডার যে এত রিক্ত হ'য়ে

গেছে, ভাবতেও পারি নি। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার লোভে যে ঘোষ গোয়েন্দাগিরি করবে তার আর বিচিত্র কি!

পণ্ডিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, -মাত্র দিন কতক আগে মুক্তির জন্যে?

—দিন কতকই কি কম? দু'টো দিন আগে মুক্তির জন্যে আমি... কিন্তু আমার কথা থাক্। বেষ্টো পালালো কেন? বুড়ো বিষ খেলো কেন? পাঁচ বছর পরে সে তো দিব্যি মুক্তি পেতো। কিন্তু পাঁচ বছর পরে মুক্তি পাওয়ার কোনো মানে নেই। মানুষ আজকে মুক্তি চায়,—এক্ষুনি। এই মুহূর্তের বন্ধনের হাত থেকে রেহাই পাবাব জন্যে বুড়োকে চরম মুক্তির আশ্রয় নিতে হোল।

পণ্ডিত কহিল, কিন্তু আমরা তো রয়েছি। আমরা তো আত্মহত্যা করি নি।

– রযেছি, কাবণ আমাদের মনের জোর ওদের চেয়ে বেশি;—কারণ পৃথিবীর ওপর মমতা, কোনো রকমে বেঁচে থাকার ওপব মমতা ওদের চেয়ে বেশি। আমরা আত্মহত্যা কবি নি, কিন্তু করা বিচিত্র নয়।

বিচিত্র নয়? আমার পক্ষে তো অসম্ভব।

বিশ্বেশ্বর সায় দিয়া বলিল,— আমার পক্ষেও। কিন্তু তুমি বাইরে লাখ টাকা গচ্ছিত বেখে এসেছ। নিবাপদে বাকী জীবনটা সেই টাকা ভোগ করার লোভ তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমারও পৃথিবীর কিছুই ভোগ করা হয নি। সেই অনাস্বাদিত আনন্দের লোভে দিন গুণে চলেছি। নইলে কি যে কোরতাম, নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।

পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের একটা যুক্তিও গ্রহণ করিল না। হাসিয়া বলিল,— যাই বলো, ঘোষের এই নিচতা কোনো মতেই সমর্থন করা যায না।

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল,—সমর্থন তো করছি না। কেন সে এ কাজ করলে তাই বিচার ক'রে দেখছি। এবং যতই দেখছি ততই বিশ্বাস হচ্ছে, এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই, ঘোষের 'পরে ক্রুদ্ধ হবারও কিছু নেই।

—ক্রোধ তো নয়, ঘৃণা।

বিশ্বেশ্বর দৃঢ় স্বরে বলিল,—না, ঘৃণাও হয় নি।

সেই দিনই জেলারের মারফৎ ঘোষ নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিল, কাল সকালে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর হইতে তাহার সমস্ত কিছু যেন যাদুস্পর্শে বদলাইয়া গেল। যাহাব পায়ের শব্দ পাওয়া যাইত না, কারণে-অকারণে তাহার চলা-ফেরা এত বাড়িয়া গেল যে, তাহার জুতার খট্‌খট্‌ শব্দে সকলে অস্থিব হইয়া উঠিল। যখন-তখন তাহাব অকারণ উচ্চ হাস্যে ওষার্ড মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার সামনে সকলেই কাষ্ঠহাসি হাসে, কিন্তু আড়ালে অনেক কথাই হয়।—

গ্রিফিথ বলে,—বাবা, ছাড়া আমরাও একদিন পাবো। কিন্তু ও যেন একেবারে দিগ্‌বিজয় কবতে চলেছে।

পণ্ডিত একটুখানি কুটিল হাসিযা বলে, ও যে অনেক মূল্যে মুক্তি কিনেছে। স্ফূর্তি করবে না?

—কি বকম? কি রকম? সকলেই গোপন কথাটা শুনিবাব জন্য উদ্‌গ্রীব হইযা উঠে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বব তাহার গা টিপিযা নিবস্ত কবে। পণ্ডিত চুপ করিযা যায়। গেলে কি হইবে? ধর্মঘট অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওযার পর, তাহার যে অকস্মাৎ দশ-বারো দিনের মেয়াদ মাফ হইয়া গেল, তাহাতে অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ করিযাছিল। পণ্ডিত এইভাবে চুপ কবিযা যাওয়ায় সেই সন্দেহই সকলের মনে প্রবল হইযা উঠে।

গ্রিফিথ বলিল,—ও আমরা জানতাম।

বিশ্বেশ্বর বিরক্ত ভাবে বলিল,—কি জানতে?

—যে ওই বেটাই গোয়েন্দা,—নিশ্চয় ওই বেটা। আর কেউ নয।

বিশ্বেশ্বর রাগিয়া বলিল,—ও সব বাজে,—মিথ্যে কথা।

এ কথাটার এইখানেই শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু মিরাণ্ডার মারফৎ যথাসময়ে ঘোষের কানেও পৌঁছিল। বিদায়ালাপের অছিলায় সে বিকালের দিকে বিশ্বেশ্বরের ঘরে গেল।

—তা হোলো বিশ্বেশ্বর, এইবারে তো চললাম। হয় তো অনেক দিন অনেক কষ্টই—

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিয়া বলিল,—বিলক্ষণ! বোসো, বোসো,—আর তো তোমায় পাবো না। আজকেই শেষ গল্প ক'রে নিই।

ঘোষ বিনীত ভাবে বসিয়া বলিল,—কাল পর্যন্ত জেলের কষ্ট অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের পেয়ে সুখে-দুঃখে মন্দই বা কি ছিলাম!

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—কিন্তু এক্ষুনি যদি খবর আসে, কাল তোমার যাওয়া হবে না, তা হোলে?

ঘোষ শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল,—সে কথা উঠেছে না কি?

তাহার ভয় দেখিয়া বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল,—না, ওঠে নি। যদি উঠতো সেই কথা বলছি।

ঘোষ আশ্বস্ত হইল। হাসিয়া বলিল,—তা হোলে আমার ঠিক হার্টফেল করে। ঘোষ আর একবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

পরে গম্ভীর হইয়া বলিল,—কিন্তু মুক্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পেছনের দিনগুলির পানে চাইলে মনে হয়, সুখে-দুঃখে সেও মন্দ কাটে নি। অন্তরের হিসাব করলে দেখা যাবে, অনেক কিছুই হারিয়েছে। কিন্তু মন যেন আজকে আর তার জন্যে শোক করতে চাইছে না। বলছে,—হোক গে ক্ষতি। তবু দিন তো কেটেছে। তোমাদের কাছ থেকে কিছু আনন্দ তো পেয়েছি। সেও কি কম লাভ?

ঘোষের কণ্ঠস্বরে বিশ্বেশ্বরের সন্দেহমাত্র রহিল না যে, এ কথা তাহার

অন্তরের কথা। সে বিস্মিত ভাবে বলিল,—তোমার কি সত্যই তাই মনে হয়?

ঘোষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—সত্যই তাই মনে হয়।

—এতগুলো বছর যে মিছি-মিছি নষ্ট হোল সে জন্যে দুঃখ হয় না?

—দুঃখ হয় বই কি! কিন্তু সে দুঃখ আজকে সইতে পারি।

বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ কি যেন ভাবিল। তারপর সে চিন্তা ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আচ্ছা, বাইরে গিয়ে তুমি আবার 'প্রাক্‌টিস্‌' করতে পাবে?

—পাবো বোধ হয়, কিন্তু পারবো না। এর পরে হাইকোর্টে আর মুখ দেখানো যায় না।

—তা যায় না। কি করবে তা' হোলে?

ব্যস্তভাবে ঘোষ বলিল,—ঐ কথাটি তুলো না। কি করবো সে আমিও জানি না। ও কথা ভাবতে ভয় করে,—ভাবিও না। মনে এলেই দু'পাশে ঠেলে ফেলে দিই। আগে বাইরে তো যাই, তারপর সে হবে।

বাইরের কথায় ঘোষের কণ্ঠস্বর যেন ভিজিয়া গেল। বলিল,—আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না যে, কোনো দিন বাইরে যাব,—আবার ট্রামে-মোটরে উঠতে পাবো,—ইচ্ছামত ফুটপাথে চলতে পাবো। ঠিক জানি ছাড়া পাব, তবু বিশ্বাস করতে পারি না।

ঘোষের কথা শুনিতে শুনিতে বিশ্বেশ্বর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময় বলিল,—তুমি শাশ্বতীর কাছে যাবে না?

ঘোষ ইতস্তত করিয়া বলিল,—তুমি কি বলো? যাবো?

—না, যেও না। কাজ কি গিয়ে? তুমি বরং বড়-সড় দেখে একটি মেয়ে বিয়ে কর।

—বিয়ে? ঘোষ হাসিয়া ফেলিল,—আমাকে মেয়ে দেবে কে?

—দেবে, দেবে। যারা কুষ্ঠরোগীর হাতেও মেয়ে দিতে পারে, তেমনি কারো মেয়ে। আমি বলছি, তাতে তুমি সুখী হবে।

বিশ্বেশ্বরের কথায় ঘোষ হাসিতে লাগিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া যে জন্য তাহার আসা, এইবারে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে একটা বিশ্রী গুজব উঠেছে, শুনেছ বোধ হয়?

এই প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে বলিল,—শুনেছি। কিন্তু ও তো মিথ্যে কথা। আমি ওর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।

ঘোষ রাগিয়া বলিল,—তবে অমন কথা রটে কেন? রটায় কে?

বিশ্বেশ্বর তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল,—এ 'কেন'র কি জবাব আছে? অনেক মিথ্যে কথাই অনেক কারণে রটে। আমার মনে হয়, হিংসে করেই কেউ এ কথা রটিয়েছে।

ঘোষ আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—ও! আমি ছাড়া পাচ্ছি সেই হিংসেয়।

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ঘোষ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে প্রশ্ন কোনো মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে করিতে পারিত না।

ঘোষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার হিংসে হচ্ছে না?

—হচ্ছে বই কি?

—তবে তুমি এ গুজব বিশ্বাস কর না কেন?

বিশ্বেশ্বর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাঝে মাঝে ঘোষের মাথা খারাপ হইয়া যায়। সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—তা হোলে তোমার কাছে আর মিথ্যে বলবো না বিশ্বেশ্বর, গুজবটা সত্যি। আমিই সিপাহীর মারফৎ জেলারের কাছে খবর দিতাম। কেন যে দিতাম তাও জানি না, ওই এক আমোদ!

—শুধু আমোদের জন্যে?

—ভগবানের দিব্যি, শুদ্ধ আমোদের জন্যে।

ঘোষের কণ্ঠস্বরে লজ্জার চিহ্নমাত্র নাই।

—তোমার মেয়াদ মাফ হবে এই ভরসায় নয়?

—না। মেয়াদ মাফ হ'তে পারে আমি তাই কোনো দিন ভাবি নি।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল! কিন্তু পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘোষ আর একটু তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আব্দারের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল,—তুমি আমাকে সাধু লোক ভাবতে, না?

বিশ্বেশ্বর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, না। আমি সবই জানতাম।

বিশ্বেশ্বর বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘোষের মুখে বিস্ময় অথবা বেদনার কোনো চিহ্নই ফুটিতে দেখা গেল না।

•

পরের দিন সত্যই ঘোষ চলিযা গেল। তখন সকাল আটটার বেশি নয়, আফিস হইতে তাহার মুক্তির সংবাদ লইয়া একজন লোক আসিল। সকলেই ইহাকে মুক্তি-দূত বলিযা ডাকে। লোকটিব মুখে গ্রীকদেব মতো দাঁড়ি,—তৈলাভাবে মলিন স্বর্ণাভ; ঠোঁটে হাসি লাগিয়াই আছে।

ও জেলের কর্মচারী নয়, দীর্ঘ মেযাদের একজন কয়েদী মাত্র। কাহারও মেয়াদ শেষ হইলেই ও আসে মুক্তির সংবাদ বহন করিযা। কিন্তু ওব নিজেব মেয়াদ কবে শেষ হইবে, সে খবব কেউ রাখে না।

মুক্তি-দূতের প্রতীক্ষাতেই ঘোষ যেন বারান্দায পায়চাবি কবিতেছিল। সংবাদ আসা মাত্র সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা কবিতে পারিল না। সকলেব সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও হইল না। এবং বিদায় জানাইযা সে যে কি বলিল, তাহারও কিছুই বোঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার বিদায লইবার ভঙ্গি দেখিয়া প্রথমটা খুব এক চোট হাসি পড়িয়া গেল। ইহারও পূর্বে অনেকেই তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া

চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই এমন করিয়া যায় নাই। আনন্দ কি হয় নাই? তাহাদেরও আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু পিছনে যাহারা রহিল তাহাদের মুখ চাহিয়া সে আনন্দ যথাসাধ্য সংযত রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিল।

পণ্ডিত বলিল,—ওটা বদ্ধ পাগল!

গ্রিফিথ বলিল,—কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শয়তানী বুদ্ধি যথেষ্ট আছে।

জোসেফ বলিল,—সখের পাগল। তালে ঠিক আছে।

যাহার যাহা ঝাল আছে, নিঃশেষে ঝাড়িল।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার যে বাসায কি খবর দেবার ছিল, দিয়েছো তো? না ভুলে ব'সে আছ?

—দিয়েছি তো। কিন্তু উনি যে কষ্ট ক'রে শ্যামবাজার পর্যন্ত যাবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভুলেই যাবেন হয় তো। মাথার তো ঠিক নেই।

বিশ্বেশ্বর বলিল,—এমনি কথাবার্তায় তো বোঝা যেত না, ওর মাথা খারাপ?

পণ্ডিত বলিল,—তা যেত না। কিন্তু হঠাৎ ও এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসত।

বিশ্বেশ্বরের প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল। সে হাসিযা বলিল,—আমাব সঙ্গে প্রথম যেদিন আলাপ হ'ল, সেদিন কি জিগ্যেস কবেছিল জানো? বেশ কথা বলছিল, হঠাৎ জিগ্যেস ক'বে বস্‌ল, আপনি ঘোড়ায চড়তে জানেন? ঘোড়ায় চড়ার কথা কি ক'রে ওর মনে এল, ওই জানে।

জোসেফ তাহাকে বাধা দিযা বলিল, —মনে এল, না ছাই! সমস্ত ছলনা।

কিন্তু সমস্ত রাগ নিঃশেষ করিযাও তৃপ্তি হইল না। তাহাদেবই চোখের সম্মুখ দিয়া একজন মুক্তি পাইয়া চলিযা গেল, আব তাহারা এখনও জেলে পচিতেছে,—আরও কতদিন পচিবে কে জানে,—এই অবস্থা তাহারা মনের মধ্যে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। মনে হইল, এ যেন

তাহাদেরই উপর অন্যায় করা হইল। এমনি মানসিক অবস্থায় সকলেই গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বর ঘোষের শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—যাই বল, ওয়ার্ডটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

সকলেই ঘরের দিকে চাহিল।

খাটের উপর গদীটা ঠিকই আছে, কিন্তু চাদরটা সরিয়া গিয়াছে,--বালিশটাও তাল পাকাইয়া এক কোণে পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর গত কল্যকার নৈশাহার যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিযাছে,—ভালো করিয়া খাযও নাই। কতকগুলো ময়লা পোষাক এক কোণে এলোমেলো ভাবে পড়িয়া। যে-প্রতিবেশীটি দীর্ঘকাল এই কক্ষে সুখে-দুঃখে কাটাইযা গিয়াছে, সে আজ নাই।

একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস সকলের অন্তস্তল হইতে উঠিযা সেই শূন্য কক্ষে ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল।

আরও অনেক দিন গেল।

জেলে আসার প্রথম দিকে বিশ্বেশ্বরের শরীর খুবই খারাপ হইয়া গিযাছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সে কমনীয়তা ফিরিয়া না পাইলেও স্বাস্থ্য ফিবিয়া পাইযাছিল। আবার গত দুই-তিন বৎসর হইতে শরীর তাহার ভালো নাই। গত ছয়মাস যাবত সে ক্রমাগতই একটা-না-একটা রোগে ভুগিতেছে। মাঝে-মাঝে ঘুস্‌ঘুসে জ্বরও হয। কিন্তু হাসপাতালে যাইবার ভয়ে অসুখের কথা চাপিযা যায়।

হাসপাতালে ভয়ের কিছুই নাই,—বরং বিশেষ আরামেরই ব্যবস্থা আছে। তবু তাহার ভয় করে। এখানে দীর্ঘদিনের সহবাসে একটা আবেষ্টনী গড়িয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে সে আবেষ্টনী পাইবে কোথায়! সেই অপরিচিত আবেষ্টনীর ভয়ে সে জ্বরের কথা চাপিযা যায়। ডাক্তার রোজই আসেন,—কিন্তু রোগী নিজে রোগের কথা না জানাইলে তিনি কি করিবেন! ফলে তাহার দেহের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, দেখিলে আর চেনা যায় না। মনেরও সে লঘু স্বচ্ছন্দ ভাব আর নাই। সর্বদাই বিমর্ষ ভাবে বসিয়া-বসিয়া কি যেন ভাবে।

পাঁচ বৎসর এক জেলে একাদিক্রমে বাস করার ফলে জেলের হাওয়া একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। সেই পরিচিত কয়টি লোকের অতি পরিচিত রসিকতা, সেই দৈনন্দিন কার্যক্রম গরুর গাড়ির মতো অলস, মন্থর গতিতে ঠুক্‌ঠুক্ করিযা চলিতেছে, এবং তাহাব মধ্যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত গণিযা কাটাইয়া সে একেবারে হাঁফাইযা উঠিযাছে।

মেজাজও তাহার অসম্ভব বকম রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া মানুষের মুখ দেখিলেই তাহাব পিত্ত জ্বলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে পণ্ডিতের সঙ্গে এক চোট হইয়া গিয়াছে।

কোন্ মান্ধাতার আমলে ঘোষকে সে কি বলিয়া দিয়াছিল, ঘোষ তাহা তাহার বাড়িতে বলিয়া আসে নাই। ঘোষের চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই পণ্ডিত তাহা তাহার বাড়ির লোকেদের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছিল। এখন আবার তাহার কন্যার যোটক-বিচার লইয়া নূতন কি একটা গোলযোগ হইয়াছে খবর পাইয়া পণ্ডিত আবার সেই পুরাতন কথার জের টানিতেছে। তাই লইয়াই বচসা।

কিছু পরেই নবী নওয়াজ আসিয়া উপস্থিত।

দাঁত বাহির করিয়া নবী নওযাজ বলিল,—মাস্টের, বেষ্টো আবার এসেছে।

বেষ্টোর কথা এতদিন পরে বিশ্বেশ্বরেব মনেই ছিল না। পণ্ডিতের সঙ্গে কলহের ঝাঁঝ তখনও তাহার মন হইতে যায় নাই। সে মুখ বিষ কবিষা একখানি চেয়ারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিল। ইহার উপর নবী নওয়াজ আসিয়া বেষ্টোর শুভাগমন-সংবাদ দিতেই সে একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল।

মুখ ভ্যাংচাইবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—তবে তো আমি স্বর্গে চললাম।

তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া নবী নওয়াজ তো অবাক। সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিতে লাগিল,—না, তাই বলছিলাম, তাই বলছিলাম।

বিশ্বেশ্বর তাহাকে নিচের উঠান দেখাইয়া দিয়া বলিল—ওই দিকে গিযে বলগে।

নবী নওয়াজ বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

কিন্তু বিকেল বেলায় ছাপাখানা হইতে ফিরিবার পথে ওই বেষ্টোরই সঙ্গে যেই দেখা, অমনি সহাস্যে বিশ্বেশ্বর বলিল, এই যে, বিষ্ণুচরণ, আবার এসেছ বাবা?

পরম বৈষ্ণবের মতো দু'টি হাত যোড় করিয়া বেষ্টো বলিল,—আজ্ঞে,

আপনাদের মায়া আর কাটাতে পারলাম না।

—বেশ, বেশ। ক'বছর?

—আজ্ঞে, জেল-পালানোর জন্যে এক বছর হ'য়েছে। আরও একটা ঝুলছে।

জেলেই বেষ্টোর শরীর ভালো থাকে। জেলের বাহিরে থাকিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার শীর্ণ দেহের পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল,—আরও একটা ঝুলছে! বাঃ! বাঃ! তুমি তো একটা অসাধারণ লোক হে।

আত্ম-প্রশংসায বেষ্টো বিগলিত হইযা আর একবার হাত দু'টি যোড় করিল।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—আর যেটি ঝুলছে সেটি কি?

—আজ্ঞে, ৩০২।

বিশ্বেশ্বর চমকিযা উঠিল। আস্তে-আস্তে বলিল,—তোমার স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত খুনই ক'রে ফেললে?

বেষ্টো অম্লান বদনে বলিল,—আজ্ঞে তাই তো পুলিশ বলছে।

বিশ্বেশ্ববেব মুখ ধীরে-ধীরে পাথরের মতো কঠিন হইযা উঠিতেছিল। বেষ্টোব পানে কিছুক্ষণ অপলক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা কবিল,—আর তোমাব মেযে?

মেযের প্রসঙ্গ বেষ্টো উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক নয। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। অর্থাৎ তাহাকে খুন কবে নাই। তাবপর নিজের পথে চলিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাব সময বিশ্বেশ্বরের ভীষণ জ্বর আসিল। রাত্রে তো ঘবেব মধ্যেই বন্ধ থাকে,—কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিযাছিল, সকাল বেলায় জ্বব ছাড়িযা গেলে আর কোনো হাঙ্গামাই হইবে না।

কিন্তু সকাল যখন হইল, তখন তাহার আর উঠিবার শক্তি নাই। চোখ জবা ফুলের মতো লাল হইয়াছে,—বুকে অসহ্য ব্যথা,—১০৪ ডিগ্রি জ্বর। ডাক্তার আসিয়াই তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি বলিলেন,—টাইফয়েড ব'লেই মনে হচ্ছে,—তবে নিউমোনিয়াও হ'তে পারে।

দিন বিশেক একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় কাটিবার পর, দুইজন ডাক্তার একমত হইয়া বলিলেন, নিউমোনিয়া নয়। কিন্তু কি, তাহা সঠিক জানা গেল না।

না যাক্। এই বিশ দিন এবং ইহার পরে আরও বিশ দিন বিশ্বেশ্বর একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইল। কখনো লোক চিনিতে পারে, কখনও পারে না—ঘোলাটে চোখ মেলিযা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিযা থাকে।

আর কাহারো তাহার সহিত দেখা করিবার তেমন সুবিধা নাই। কেবল নবী নওয়াজ মাঝে মাঝে যায়। কখনো ডাক্তারের কাছে তাড়া খাইযা দ্বার-প্রান্ত হইতেই পালাইয়া আসে কখনো বা কাছে বসিয়া ললাটে মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দেয়,—বাড়িতে খবর পাঠাইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করে।

বিশ্বেশ্বর কতক শুনিতে পায়, কতক পায় না;—তাহাব নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইযা পড়ে।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের সকলে বিশ্বেশ্বরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। সকালে ডাক্তার আসিলেই তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া প্রশ্নের পব প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

ডাক্তারটি নিতান্ত ভালো মানুষ;—মোটা-সোটা নাদুস্-নুদুস্ ভদ্র-লোক। ডাহিনে-বামে ঘাড় দোলাইয়া ঠুক্ ঠুক্ করিযা চলেন এবং পথ চলিতে চলিতে সর্বদাই আপন মনে কি যে ভাবেন তিনিই জানেন, আর মুচকি মুচকি হাসেন। এক সঙ্গে জেল গেট হইতে বাহিব হইয়া তাঁহাব সঙ্গের লোক যখন হাসপাতালে পেঁৗছিযা যায, তিনি তখনও অর্ধেক পথ অতিক্রম কবিতে পারেন না।

এমন লোককে কেহই ভালো না বাসিয়া পারে না। রাজনীতিক ওয়ার্ডে তো ইঁহাকে লইয়া যথেষ্ট কৌতুকের অবতারণা হয়। কেহ নকল করে ইঁহার হাঁটিবার ভঙ্গি, কেহ বা কথা কহিবার ধরণ। ওয়ার্ডে আসিলে সকলে ইঁহাকে খাওয়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইনি একটা প্রকাণ্ড উদ্গার তুলিয়া বলেন,—ওরে বাপ্! আজ? অসম্ভব!

এবং কেন অসম্ভব, তাহা বুঝাইতে গিয়া সকালের আহারের এমনি একটি বিরাট তালিকা পেশ করেন যে, সে পরিমাণ দ্রব্য যিনি উদরে স্থান দিতে পারেন, অগ্নিমান্দ্য তাঁহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে পারে না।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়ে না। অত বড় উদ্গারের পরও খানকয়েক টোস্ট তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

—না, না,—চা দেবেন না। সকাল থেকে তিন পেয়ালা হয়েছে। আবার?

ডাক্তার ইহাদের হাত এড়াইবার জন্য চেয়ার লইয়া দূরে সরিয়া যান। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই;—চতুর্থ পেয়ালা চাও পান করিতে হয়।

—আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, আপনি কখনও বাঘ শিকার করেছেন?

শিকারের কথায় ডাক্তার বাবুর সমস্ত মুখ উৎসাহে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে,—ঠোঁটের দুই কোণ এবং চিবুকের দিকটা ঝুলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটা বিস্ফারিত হয়।

ডাক্তার বলেন,—করেছি। কিন্তু বড় নয়, ছোট।

—রয়াল বেঙ্গল?

চোখ মিট্ মিট্ করিয়া সায় দিয়া ডাক্তার বলেন,—রয়াল বেঙ্গলের বাচ্ছা।

তারপর বাঘ শিকারের অদ্ভুত বর্ণনা। ডাক্তারের কণ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া বাঘের মতো হুংকার দেয়, চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতো জ্বলিয়া ওঠে,—সমস্ত দেহ সংকুচিত এবং দুই হাত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া তিনি

বাঘের মতো লাফ দিবার আয়োজন করেন। কিন্তু তখনি বাঘের আক্রমণকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহার মুখে একটা প্রশান্ত ভাব এবং ঠোঁটের কোণে উপেক্ষার হাসি ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতের কাল্পনিক বন্দুক হইতে গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম করিয়া গোটা তিনেক গুলি ছুটিয়া যায়। একটা লাগে বাঘের হাঁ মুখে, একটা পিঠে আব একটা পেটে। ডাক্তাব নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে ভালো করিয়া বসেন।

—কিন্তু ছোট বাঘ,—রয়াল বেঙ্গলের বাচ্ছা।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে গিয়া তিনি আব একটু কঠিন হন।

সেদিন সকালে সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল,—বিশ্বেশ্বব কেমন আছে?

ডাক্তার ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন,—ভালো না।

—বাঁচবে তো? বাঁচবে তো?

ডাক্তার আকাশেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিলেন,—ভগবান জানেন।

ভগবান তো জানিবেনই। কিন্তু তিনি জানেন কি না?

তিনি জানেন না। রোগ কঠিন হইলেই তিনি রোগীকে ভগবানের চিকিৎসায় ছাড়িয়া দেন। না বাঁচিলে রোগীর আত্মীয়েরা ভগবানেব সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। আর বাঁচিলে তিনি গিয়া রাজনীতিক ওয়ার্ডে গল্প ছাড়িবেন।

পণ্ডিত চটিয়া বলিল,—ভগবান যে জানেন, সে সবাই জানে। কিন্তু তিনি তো 'ফিজ্' নেন না,—মাস মাস মাইনে নেন আপনি।

অন্য কেহ হইলে ভীষণ চটিযা যাইত। কিন্তু ডাক্তার বাবু হাসিয়াই খুন!—

এ তো বেশ বলেছেন মশাই! ভগবান 'ফিজ্' নেন না। নিই আমি! অ্যাঁ? এ তো মন্দ বলেন নি!

ডাক্তার চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার আসিলেন। তাঁহার হাসি আব থামে না,—গমকে গমকে হাসিযা ওঠেন।

মিরাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল,—রোগটা কি?

ডাক্তার তাহার পানে সকৌতুকে চাহিয়া বলিলেন,—রোগ? ইউবি-আণিকো নিউমো-সিগ্রয়েড। কি বুঝলে?

কেহই কিছু বুঝিল না।

ডাক্তার বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—খুব কঠিন রোগ।

এবং সমস্ত রাস্তা ফিক্-ফিক্ করিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে হাসপাতালে চলিলেন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া জেলকর্তৃপক্ষ অবশেষে বিশ্বেশ্বরের মাতাকে জেলে আসিয়া পুত্রের শুশ্রূষা করিবার অনুমতি দিলেন।

আনন্দময়ী বাহির হইতে একবার খাইয়া আসেন, আর সমস্ত দিন রাত্রি সন্তানের পাশে বসিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর মাঝে মাঝে তাঁহার পানে চায়, কিন্তু ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারে না।

আনন্দময়ী তাহার মুখের উপর মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—আমাকে চিনতে পারছিস্ না? আমি,—মা। ওই যে পাশে গুণেন ব'সে রয়েছে,—তোর দিকে। চিনতে পারছিস্ না?

কিন্তু সে কাহাকেও চিনিতে পারে না,—বোধ করি, মায়ের স্বর কাণেও পেঁাছে না। সে অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

ইহার পর হইতেই সে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। এবং দুজন ডাক্তার তাহার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, উৎকণ্ঠা ও আশংকায় আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্রের বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল। ডাক্তার ক্রমাগত আশ্বাস দেয়, কিন্তু তাহাতে কি মায়ের মন মানে?

সন্ধ্যার পর হইতে বিশ্বেশ্বরের ঝোঁক চাপিল। সে কেবল-ই চীৎকার করিতে লাগিল, আমার মা কই? আমার মা?

আনন্দময়ী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলেন,—এই যে আমি, বিশু। এই যে তোর কাছেই।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর কিছুতেই তাহা শুনিবে না। সে তাহার এদিকে-ওদিকে হাতড়াইয়া কেবলি খুঁজিয়া দেখে।

কখনো অমলাকে ডাকে। চীৎকার করিয়া বলে,—অত দূরে কেন দাঁড়িয়ে রইলে? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে। অত আস্তে কথা কও কেন? কিছু শোনা যায় না যে। আমার চার পাশে এরা যে কেবলি চ্যাঁচাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সুর করিয়া বিশ্বেশ্বর ডাকে,—তুমি এসো, তুমি,—এসো, —তুমি এসো।

আর বালিশের উপর মাথা নাড়ে। ওই মাথা নাড়াই খারাপ।

কখনো বা এমন বিশ্রীভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করে যে, চার পাশে যাহারা থাকে তাহারা লজ্জায় কেহ কাহারো মুখের পানে চাহিতে পারে না। হোক প্রলাপের ঘোরে,—তবু তাহার শুভ্র অন্তরের কোণে কোণে এত কুশ্রীতাও জমা আছে, ভাবিতে গিয়া আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্রের মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে।

কিন্তু তখনি বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠে কহে,—ওঃ! কি যন্ত্রণা!

অমনি সকলের স্নেহসিক্ত চোখ তাহার উপর নিবদ্ধ হয়।

এমনি করিয়া প'য়তাল্লিশ দিন যমে-মানুষে লড়াই চলার পর মানুষই জয়ী হইল। বিশ্বেশ্বর এ যাত্রা রক্ষা পাইল। রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু হাস-পাতালের হাত হইতে নয়। আরও একমাস তাহাকে হাসপাতালের খাটে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তখন আনন্দময়ী ও গুণেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। রোগীর জীবনের আশা ফিরিয়া আসিতেই তাঁহাদের চলিয়া যাইতে বলা হয়।

পথ্যগ্রহণের পরও বিশ্বেশ্বরের মস্তিষ্কের দুর্বলতা গেল না। কথা কহিতে ক্লান্তি বোধ হয়,—পাশে কেহ গল্প করিলে, কিংবা জোরে কথা কহিলে

বিরক্তি লাগে। দিনরাত্রি চুপ করিয়াই শুইয়া থাকে।

দুপুরে জানালার বাহিরে ঘনপত্রবহুল কতকগুলো গাছে অনেকগুলি ছোট ছোট পাখী কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করে। তাহার দুর্বল মস্তিষ্কে তাহা একটি সুন্দর ঔদাস্যের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে নবী নওয়াজ আসে। বিশ্বেশ্বর কোনো দিন তাহার সঙ্গে গল্প করে, কোনো দিন বা চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

অসুখের সময় তাহার মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেড়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একদিন বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল,—মাথায় হাত দিলেই আমি চমকে উঠি। হঠাৎ মনে হয়, এ যেন অন্য কারো মাথা,-- যখন অসুখের ঘোরে অজ্ঞান ছিলাম, কেউ এসে আমাব ঘাড়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

কথা শুনিয়া নবী নওয়াজ হাসিল। কহিল,—কিন্তু মাথাটা বেশ পাতলা লাগছে, না?

বিশ্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—উহুঁ। শরীরেও গ্লানি আছে, কিন্তু মাথাতেই বেশি। দিন-রাত মাথার মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

নবী নওয়াজ বিশ্বেশ্বরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চোখ বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আমার খালাস হ'তে আর কতদিন বাকী আছে? অনেক দিন তো হ'য়ে গেল। মেয়াদ কি আর শেষ হবে না?

তাহাব বন্ধুদের কে কবে জেলে আসিযাছে নবী নওযাজের তাহা কণ্ঠস্থ। সে মনে মনে অনেকক্ষণ ধবিয়া হিসাব করিয়া বলিল,—আপনার তো আর বেশি দিন দেরি নেই। বোধ হয় মাস চাব পাঁচ আছে।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহাতে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না। সে অসহিষ্ণু ভাবে নবী নওযাজেব হাতটা ঠেলিযা দিযা বলিল,—তুমি তো সবই জানো। এরা আমাকে কিছুতে ছাড়বে না,—এইখানেই মারবে। জানো? কেন যে বাঁচলাম!

বিশ্বেশ্বর পাশ ফিরিয়া শুইল।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মায়ের সঙ্গে বেশি বার দেখা হয় নাই, এবং যাও দেখা হইয়াছে, সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। এ বারে তাঁহাকে পাশে পাইয়া আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল না। তিনি যখন চলিয়া যান, বিশ্বেশ্বর ভালো করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই;—অশ্রু-গোপনের জন্য পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। আনন্দময়ী তাহার দুঃখ বুঝিয়াছিলেন। তিনিও এমন একটা দৃশ্য এড়াইবার জন্য নিঃশব্দেই চলিয়া যান। মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তাহার আর এক মুহূর্তও যেন জেলের হাওয়া সহিতেছিল না।

বিশ্বেশ্বর আবার আপন মনেই বলিল,—ছেড়েই যদি দেবে না, তবে কেন আমায় বাঁচালে? এ কি অত্যাচার!

নবী নওযাজ অনেকক্ষণ হইতেই একটা কথা বলি-বলি করিযাও বলিতে পারিতেছিল না। একবার বেষ্টোর কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়াছিল, সে কথা ভোলে নাই। কিন্তু পেটের মধ্যে কথা চাপিযা কতক্ষণ থাকা যায়?

সে বিশ্বেশ্বরের কথার সুযোগ লইযা বলিল,—কিন্তু মাস্টের, ম'রেই বা কি লাভ হ'ত! তবু তো একদিন ছাড়া পাবো আমরা,—আবার দুনিযাটা ভোগ করতে পাবো। কিন্তু এই যে বেষ্টোর ফাঁসী হ'য়ে গেল—দুনিযাব সঙ্গে ওর আর কি সম্পর্ক রইল?

বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল! মানুষ জ্বরে বেশ মরিতে পাবে কিন্তু ফাঁসীতে?

বিশ্বেশ্বর বিবর্ণ মুখে বলিল,—বেষ্টোর ফাঁসী হ'য়ে গেল? ফাঁসী?

—সে এক রকম হওয়াই বই কি! লাট সাহেবের কাছে জীবনভিক্ষা চাওয়া হ'য়েছে। কিন্তু তাকি আর পাবে?

—তা'হোলে?

তাহা হইলে যে কি হইবে, তাহা কেহই জানে না।

[১৫]

শরীর একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেই বিশ্বেশ্বর হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইল। সে যখন ওয়ার্ডে ফিরিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কঠিন অসুখে ভুগিলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়। কিন্তু এ অন্যরূপ, ললাটে অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে, চোখে অবসাদ এবং কেমন একটা ম্লান নিঃস্পৃহা। এই দুই মাসেই সে যেন বৃদ্ধ হইয়াছে।

এমন লোককে লইয়া হৈ চৈ করিয়া আনন্দ করা চলে না। প্রথম আলাপ অত্যন্ত মামুলি প্রথায সম্পন্ন হইল। এবং তারপরেও যে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিত, সে অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে দু'একটি কথা কহিয়াই চলিয়া যাইত।

অসুস্থতাব জন্য বিশ্বেশ্বর আবও এক পক্ষকাল প্রেসে কাজ না করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এবং জেলার আসিয়া এমনও বলিয়া গিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে আরও পনেরো দিন তাহাকে ছুটি দেওযা হইবে। তাহার আহারও হাসপাতাল হইতেই আসে। সকালে-বিকালে ডাক্তার বাবু দু'বেলা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান, এবং কি ভাবে, একমাত্র তাঁহারই চিকিৎসার বলে তাহাকে বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে সে কথা সকলকে শুনাইয়া যান। আরম্ভ করেন তাহার মায়ের শুশ্রূষা করিবার অদ্ভুত শক্তির বর্ণনা করিয়া এবং শেষ করেন নিজের অত্যদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া। বিশ্বেশ্বর সকল কথাই শোনে, কিন্তু কেন যে তাহাকে বাঁচানো হইল তাহা আজও বুঝিতে পারে না। তবু নিঃশব্দে শুনিয়া যায়।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে ফিরিয়া আসার পরের দিন, কিংবা তারপরের দিন সে তাহার জেলটিকিট লইয়া হিসাব করিযা দেখিতেছিল, তাহার ছাড়া

পাইবার আর ঠিক কতদিন দেরি আছে। সহজ হিসাবে পাঁচ মাস দেরি, কিন্তু অংকশাস্ত্রের কোনো কঠিনতর প্রক্রিয়ার দ্বারা মেয়াদ আরও একমাস কমাইতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য সে দ্বিতীয় বার হিসাবে মনঃসংযোগ করিল। অকস্মাৎ একটা আর্তনাদ উঠিল। তাহার মনে হইল দূরে কে যেন সুর করিয়া কাঁদিতেছে। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে নির্ণয় করিবার জন্য সে সমস্ত বারান্দা ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে করিল ঘানিঘরের ওদিক হইতে,—একবার মনে হইল বিচারাধীন কয়েদীর ওয়ার্ড হইতে। কিছু পরে আর শোনা গেল না।

আবার সে মেয়াদের হিসাবে মনোনিবেশ করিতেই আবার সেই কান্না। কি বলে বোঝা যায় না, শুধু একটা করুণ সুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাসিয়া আসে।

বিশ্বেশ্বর নিচের সিপাহীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে কাঁদিছে দেখ তো?

সিপাহী সতর্ক ভাবে কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল,- কাঁহা রোতা হায বাবুজি?

বিশ্বেশ্বর অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, ওই তো কাঁদছে! শুনতে পাচ্ছ না?

এবারে সিপাহী বুঝিল। হাসিয়া বলিল,—রোতা নেহি বাবুজি, গানা করতা হৈ।

গান? অমনি করিয়া গান করে?

বিশ্বেশ্বর আশ্বস্ত হইল,—তাহা হইলে কান্না নয়। সিপাহীটা বলিল, ফাঁসীর ওয়ার্ডে বেন্টো বলিয়া নূতন যে লোকটি আসিয়াছে, সেই গান গাহিতেছে। কান্না নয়, মনের আনন্দেই গান গাহিতেছে।

ফাঁসীর আসামী মনের আনন্দে গান গাহিতেছে? এবং সে আসামী আর কেহ নয় বেন্টো? বিশ্বেশ্বরের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য হইবারই বা কি আছে? সংসারে তাহার আকর্ষণ বলিতে কিছু নাই। একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী,—তাহাকে সে নিজের হাতেই শেষ করিয়া

আসিয়াছে; আর একটি পুত্র,—কিন্তু বেটাছেলে, ভিক্ষা করিয়াও তাহার চলিয়া যাইতে পারে; বাকী মেয়েটি,—কিন্তু তাহার কথা থাক্।

সুতরাং হাসিতে হাসিতে ফাঁসী যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

হাসপাতালে থাকিতে একখানা "ইংলিশম্যান" তাহার হাতে আসিয়াছিল। তাহাতে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—একজন খ্যাতনামা মার্কিন ব্যবসায়ী গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার বিছানায় এক টুক্‌রা কাগজে লেখা ছিল,—"আমার জীবনের কর্তব্য শেষ হইয়াছে। সুতরাং আর বাঁচিয়া লাভ নাই।" এই ব্যবসায়ী বিশেষ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর বহু কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, এবং ইঁহার জীবনব্যাপী দানের পরিমাণ পনেরো কোটি টাকা। যশ, অর্থ, বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠা,—মানুষ যাহা কিছু কামনা করে, সবই তো ছিল। ইঁহার কাছে পৃথিবীর আকর্ষণ কিছুতেই কম হইতে পারে না। তথাপি বাঁচিয়া থাকিবার যে আদিম ইচ্ছা প্রতি মানুষের বুকেই আছে, ইঁহার সে ইচ্ছা কেনই বা এত শীঘ্র শেষ হইল, কে বলিতে পারে!

অথচ এমনও দেখা যায়, অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে চিররুগ্না, কর্কশ-ভাষিণী স্ত্রী এবং বুভুক্ষু, স্বল্পায়ু সন্তান-সন্ততি লইয়া দিন যাহার আর কাটে না তাহারও জীবনের উপর কী মমতা! রুগ্না স্ত্রী চোখের সুমুখে পথ্যাভাবে চিকিৎসাভাবে তিল তিল করিয়া মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—ছেলেদের দেহে স্বাস্থ্য নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, ঘরে ফিরিবামাত্র হাঁ হাঁ করিয়া ছাঁকিয়া ধরে,—তবু মানুষ মরিতে চায় না। অদৃষ্টের কথা বলা তো যায় না;—একদিন কপাল ফিরিয়া যাইতেও পারে, এই ভরসায় তাহারা যত পারে লটারীর টিকিট কিনিয়া যায়, নয় তো লুকাইয়া স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া রেস্ খেলে।

সিপাহী বলিল,—ওর এখনও বিশ্বাস ও ছাড়া পেয়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

সিপাহী জবাব দিল,—লাট সাহেবের কাছে ওর ফাঁসী মাফ্ করবার

জন্যে আরজি করা হ'য়েছে। ওকে আমরা সবাই ভরসা দিই, লাট সাহেব ওকে ছেড়ে দেবেন।

ও! সেই ভরসায়!

বিশ্বেশ্বর ভাবিয়া দেখিল, আত্মহত্যা করা যায়,—জবরে ভুগিয়া মরা আরও সহজ,—কিন্তু ফাঁসীতে—

না, ফাঁসীতে মরা যায় না।

সিপাহী যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নয়।

দিনের পর দিন যায়! কিন্তু লাট সাহেবের কাছ হইতে কোনো হুকুমই আসে না। বেষ্টো ফাঁসীর ওয়ার্ডে একলা বসিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।

তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। রাত্রে যখন সমস্ত জেল নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার কাতর আর্তনাদ শুনিয়া কয়েদীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায। সকলেব মন তাহার ব্যথায় আর্ত হইয়া ওঠে। স্পষ্ট শোনা যায়, একটা লোক কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিদ্রিত পৃথিবীকে শুনাইযা বলিতেছে, তাহার কোন দোষ নাই,—শত্রুর চক্রান্তে পড়িয়া বিনা দোষে সে ফাঁসীতে ঝুলিতে চলিয়াছে। তাহাকে বাঁচাও,—বাঁচাও,—

বেষ্টোর কথা সত্য নয়। সে সত্যই তাহাব স্ত্রীকে হত্যা কবিয়াছে—সে অপরাধী। তবু মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথায সহানুভূতি-আকর্ষণের কি দুরন্ত প্রয়াস! কিন্তু নিদ্রিত পৃথিবীব কানে কি সকল কথা পেঁৗছায়? পেঁৗছিলে কোন্ কালে তাহাব সুখনিদ্রা চিরদিনের জন্য টুটিযা যাইত।

জেলার পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে এই জেলেই অনেকগুলা ফাঁসী দেখিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া সমস্তক্ষণ কেহ চ্যাঁচায় নাই। বেশিব ভাগ লোকেই ফাঁসীকাষ্ঠে যে সাহস দেখাইয়াছে তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয।

জেলার বলে,—লোকটা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কোনো দিন

সামান্য কিছু মুখে দেয়, কোনো দিন খাবার ছোঁয়ও না,—যেমনকার তেমনি পড়ে থাকে। সমস্ত দিন-রাত্রি খালি 'দুর্গা, দুর্গা" করে। এদিকে পেটে-পিঠে ঠেকে গেছে। দু-চার দিনের মধ্যে লাট সাহেবের কাছ থেকে ভালো-মন্দ যা হোক একটা হুকুম না এলে ও এমনিই মরে যাবে।

'সেল'এ বসিয়া বেষ্টো সমস্ত দিন যে কি একটা বলে তাহা শোনা যায়- কিন্তু সে যে "দুর্গা দুর্গা' বলে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

সকালে স্নানের সময় এবং সন্ধ্যার পূর্বে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য একবার করিয়া তাহাকে বাহির করা হয়। স্নানের সময় তো স্নান করিতেই আধ ঘণ্টা কাটিয়া যায় —সকালে ও সন্ধ্যায় কড়া পাহারায় তাহাকে ছোট উঠনটিতে পায়চারি করিতে দেওয়া হয়। পাশের ওয়ার্ডের দোতলা হইতে তাহা দেখা যায়। কিন্তু সে সময় সেখানে কাহারও দাঁড়াইবার উপায় নাই। কাহাকেও দেখিলেই সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া মুক্তির জন্য এমন করুণ আবেদন করে যে পাষাণের পক্ষেও তাহা স্থির হইয়া শোনা অসম্ভব।

একদিন সকালে দেখা গেল ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সে সকলের নিকট মুক্তির জন্য করুণ আবেদন করিতেছে এবং পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার দেহ কুব্জ হইয়া গিয়াছে চোখ কোটর প্রবিষ্ট মুখময় অপরিচ্ছন্ন দাড়ি।

কি করিয়া সেল' হইতে সে বাহির হইল তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। পরে জানা গেল সকালে মেথর যখন তাহার ঘর পরিষ্কার করিতেছিল সেই সময় দ্বার খোলা পাইয়া সকলের অলক্ষিতে দেওয়াল বাহিয়া সে ছাদে ওঠে। কিন্তু ওই দুর্বল ভঙ্গুর দেহে দেওয়াল বাহিয়া ছাদে উঠিবার শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল।

খবর পাইয়া একদল সিপাহী লইয়া জেলার তো হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বেষ্টো যদি কোনো রকমে ছাদ হইতে পড়িয়া মারা যায় কিংবা আত্মহত্যা করে তাহা হইলেই জেলারের কাজ শেষ। চাকরী তো যাইবেই কঠিনতর শাস্তিও হইতে পারে।

জেলার কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলিল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা নাড়িয়া বেণ্টোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আরে জলদী উত্তর যাও, তুমকো ফাঁসী মাফ হো গিয়া!

প্রথম বার তো বেণ্টো শুনিতেই পাইল না। আরও বার দুই বলিতে কথাটা তাহার কানে গেল।

হঠাৎ তাহার সমস্ত মুখখানি প্রদীপের মতো জ্বলিয়া উঠিল। সে একবার মাত্র বলিল,—মাফ হো গিয়া?

এবং তার পরেই তাহার অচৈতন্য দেহ ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তার পরেও আরও বহুদিন আশা ও নিরাশায় 'সেল'-এ কাটানোর পব অবশেষে বেণ্টোর ফাঁসীই হইল।

আপনার ওয়ার্ডে বসিয়া বিশ্বেশ্বর সকল সংবাদই পাইল। ফাঁসীর আগের দিন বেণ্টো সমস্ত রাত অবিরাম ভগবানকে ডাকিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সে কাতর আহ্বানে মানুষ তো ঘুমাইতে পারে নাই, দেবতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না কে বলিবে। শেষ রাত্রে যখন জেলার আসিয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলিল, তাহার কণ্ঠ হইতে শুধু একটা শীর্ণ, তীব্র স্বর বাহির হইল,—ও-ও-ও-ও—

আর কিছু শোনা গেল না। সম্ভবত ইহার পরই সে অজ্ঞান হইয়া যায়। কিংবা—

কিন্তু জেলার বলে, সে মরিয়া যায় নাই। তবে অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহার ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয় জেলারের কথাই সত্য। আর সত্য না হইলেই বা কি? দণ্ডিতের মৃত্যু ফাঁসীতেই হোক, অথবা অন্য কিছুতেই হোক, তাহাতে দণ্ডধারীর কি ক্ষতি? তবু আইন, আইন।

এই কথাটি বিশ্বেশ্বব বুঝিতে পারে না। বলে,—আচ্ছা পণ্ডিত, বেণ্টো

যদি ছাদ থেকে পড়ে মরতই, কার কি ক্ষতি! বিশেষ, লাটসাহেবের কাছ থেকে ফাঁসীর হুকুম বাহাল হয়ে আসার পর।

কি যে ক্ষতি, তাহা পণ্ডিতও বুঝিতে পারে না। তবু বলে,—ওর যে ফাঁসীর হুকুম হ'য়েছিল।

– তাতে কি? দণ্ডিত কি তার ইচ্ছামত মৃত্যু বেছে নিতেও পারবে না?

পণ্ডিত এ কথার উত্তর দিতে পারে না।

বিশ্বেশ্বর আবার বলিল, –বেষ্টোকে মেরে কারই বা কি লাভ হোল?

কথাটা পণ্ডিতের বোধ করি কানেও গেল না। তাহার মেয়ে এই কার্তিকে এগারোতে পড়িয়াছে। এই বৎসরেই তাহার বিবাহ দেওয়া চাই। যে ছেলেটির সঙ্গে বিবাহের কথা চলিতেছে, সস্তায় অমন পাত্র আর পাওয়া যাইবে না। এখন কোষ্ঠী মিলিলে হয়।

রবিবারের মধ্যাহ্ন। সমস্ত জেল নিস্তব্ধ। একটা কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কোন একটা গাছে ঠোকরাইতেছে। গোটা দুই পায়রা থামের উপর বসিয়া পাখায় ঠোঁট গুঁজিয়া ঝিমাইতেছিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে আপন মনেই বিশ্বেশ্বর বলিল– আমার জেল না হ'য়ে যদি ফাঁসী হোতো তো বেশ হোতো।

ক্লান্ত জীবন সে আর বহিয়া বেড়াইতে পারে না।

মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার স্বল্প কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কেমন বোধ করছ?

বিশ্বেশ্বর তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল না। শ্রান্ত ভাবে চোখ বন্ধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, ভালো নাই।

মিরাণ্ডা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আর তো মাস তিনেক। তারপরে বাইরে গেলেই তোমার শরীর সেরে যাবে।

গভীর নৈরাশ্যে বিশ্বেশ্বর শুধু একটু ম্লান হাসিল।

বিশ্বেশ্বরের দুর্বলতা মিরাণ্ডা জানে। সে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,—গিয়ে বেশ টুকটুকে একটি বউ এনো।

কাকাতুয়া যেমন ঘাড় বাঁকাইয়া একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বুলি শেখে, বিশ্বেশ্বর তেমনি করিয়া মিরাণ্ডার পানে চাহিল। এবং মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—হাঁ, একটি নারী,—লোকালয়ের বাইরে একখানি সুখনীড়,—প্রচুর অর্থ,—প্রচুর যশ,—অমিত বীর্য,—অক্ষুণ্ণ যৌবন, কিন্তু আমার বয়স কত জানো, মিরাণ্ডা?

—কত? তিরিশ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসিয়া বিশ্বেশ্বর সজোরে বলিল—পঞ্চাশ,—ষাট কিংবা তারো বেশি।

বিশ্বেশ্বর হাঁফাইতে লাগিল। একটু থামিয়া বলিল—আমার দেশের ছেলেরা আমার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'যে আছে। আজও তারা প্রত্যহ আমার ছবির পুজো করছে। কিন্তু আমার তাতে কি? পৃথিবী থেকে রস টেনে নেবার শক্তি গেছে, আজকে আমায় যেখানেই বসিয়ে দিক, কোথাও আমি বাড়তে পারবো না,—বাঁচতে পারবো না,—ফুল ফোটাতে পারবো না। এই ক'টা বছরে আমার শক্তি গেছে,—আমার সমস্ত গেছে।

বিশ্বেশ্বর আবার হাঁফাইতে লাগিল।

তিন মাস শেষ হইতে তখনও দুই-এক দিন দেরি আছে, এমন সময় একদিন সকালে জেলার হাসিতে হাসিতে বিশ্বেশ্বরের ঘরে আসিয়া বলিল,—Pack off. You are released—

বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বলিল,—Released!

দেখিতে দেখিতে সকলে আসিয়া জুটিল। বিশ্বেশ্বর সকলের মুখ পানে চায়,—কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারে না,সত্যই সে মুক্তি পাইয়াছে।

মিরাণ্ডা আসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া সকলের সামনেই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না।

জেলারকে ইঙ্গিতে চলিতে বলিয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে,—পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, কিছুতে সে সোজা হইযা দাঁড়াইতে পারে না। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় জেলারের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

জেলের বাহিরে আসিতেই গুণেন্দ্র এবং আর কয়েকটি ছেলে আসিয়া তাহার পাযেব কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। বিশ্বেশ্বর একবার তাহাদেব পানে, একবার পথেব পানে চাহিল।—

হু হু শব্দে ট্রাম-বাস মোটর অবিশ্রান্ত ছুটিয়াছে,—ফুটপাথে, রাস্তায জনতার সমুদ্র তবঙ্গেব পব তবঙ্গে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালেব সকাল,—এখনই বৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কবিতেছে। বিশ্বেশ্বর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও ছাযাব চিহ্নমাত্র নাই। মানুষের পায়ে পায়ে একটি তৃণাঙ্কুবও মাথা তুলিতে পাবে না। সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন পাথরে মুডিযা লোহায় বাঁধিযা রাখিয়াছে।

গুণেন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া বলিল,—চল, বিশুদা।

সেইখানেই ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িয়া বিশ্বেশ্বর অস্ফুটস্বরে বলিল,—একটু বসি।



সরোজকুমারের নবতম উপন্যাস

কালো ঘোড়া

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ৩৲

"মনুষ্য-জীবনের গূঢ়তর প্রবৃত্তি যে প্রেম—'সে ভুল প্রাণের ভুল' এবং মর্ম্মেই তাহার মূল বিজড়িত। এই প্রেম যদি অভিশাপরূপে দেখা দেয়, যদি অক্ষয় ক্ষতরূপে মানব হৃদয় একবার আশ্রয় করে তবে সকল খ্যাতি, সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার অন্তরালে মানুষ মৃত্যুর সেবাই করে—'শ্রীমন্ত'ও তাহাই করিয়াছে।"

ঘরের ঠিকানা

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য ২॥৹

"এই উপন্যাসের 'কাজলী' চরিত্রের দৃঢ়তা আত্মবিলোপের প্রবণতা এবং তাহারই ফলে একটা আত্মিক নিঃসঙ্গতা এই চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ একই কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে বিষ্ণুরথ তাহাতেই দ্রুত অধঃপতনের পথে নিশ্চিত পদক্ষেপ করিয়াছে—এবং উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতিও বেশ অবশ্যম্ভাবি হইয়াছে। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি সরোজকুমারের সর্ব্বপরিচিত লিপিকুশলতায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হইয়া আখ্যানবস্তুকে সুডৌল ও সুঠাম শ্রী দান করিয়াছে।"